চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

শিবনাথ সরকার

চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

শিবনাথ সরকার

পরিবেশক

দে বুক স্টোর

কলেজ স্ট্রীট

প্রকাশিকা :
মিনতি চৌধুরী
১ই/৩০, সেকটর-৬
ভিলাই

মুদ্রক :
শ্রীনিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৬, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :
সুচারু দাস
সহযোগিতায়
রতন সাহা

স্বর্গত

বাবা ও মাকে

পরবর্তী প্রকাশন :

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য

নিবেদন

বিশ্বের এক অপার বিস্ময় রবীন্দ্রনাথ।

সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় তিনি এনে দিয়েছেন নবীন বসন্তের পরিপূর্ণতা। গল্পে, গানে, কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে ভরিয়ে দিয়েছেন সাহিত্যের আঙ্গিনা। বিভিন্ন দেশের মনীষীরা রবীন্দ্রনাথের অমর সাহিত্যের সরস ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ ও সেই ছবি আঁকার পশ্চাৎপট প্রভৃতি সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থ এযাবত প্রকাশিত হয় নি।

আমি স্বল্প ক্ষমতার পুঁজি সম্বল করে এই দুঃসাধ্য কাজে ব্রতী হয়েছি। চিত্রশিল্পী হিসেবে কবিগুরু যে কতখানি সার্থকতা লাভ করেছিলেন, বিশ্বের সুধীজন যে তাঁর শিল্পকে বিশ্বের

চিত্রশিল্পের দরবারে কতখানি সমাদরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারই এক সম্পূর্ণ আলেখ্য এই গ্রন্থে তুলে ধরতে আমি প্রয়াসী হয়েছি।

তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বহু অনুসন্ধান চালাতে হয়েছে বহু জায়গায় গিয়ে। এ ব্যাপারে অনেকেই আমাকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছেন। অনেকের মধ্যে আছেন শান্তিনিকেতন কলাভবনের শ্রীসোমেন অধিকারী এবং রবীন্দ্রভবনের Special Officer শ্রীমতি মানসী দাশগুপ্ত। এঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টা না থাকলে চিত্রশিল্পী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের অনেক মূল্যবান তথ্য আমার এ বইয়ে যে সংগৃহীত হতে পারত না সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এরাই আমাকে শান্তিনিকেতনের 'রবীন্দ্রভবন' ও 'কলাভবনে' সংরক্ষিত কবিগুরুর বিভিন্ন সময়ের আঁকা অতি মূল্যবান ছবিগুলি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন এবং সেগুলির ওপর স্বদেশ ও বিদেশের বিদগ্ধজনের বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মতামত আমার সামনে তুলে ধরে আমার পক্ষে এই দুরূহ কাজকে অনেক সহজসাধ্য করে দিয়েছেন।

সাহিত্যের বিশাল মহীরুহ রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্পের প্রকাণ্ড কাণ্ডের নীচে দাঁড়িয়ে সেই কাণ্ডের বিশ্লেষণে নিজেকে মগ্ন রাখতে পারার প্রতিটি মুহূর্তকে জীবনের চরম সার্থকতা বলে মনে করেছি। সব সময় শঙ্কিত হয়েছি, পাছে এই বিশ্লেষণে থেকে যায় কোন ত্রুটি বিচ্যুতি। তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে মাঝে মাঝে যখন হতাশার কালোছায়ায় ঢাকা পড়েছি তখন অন্তরে অনুভব করেছি সেই দিব্যজ্যোতি পুরুষের অভয়বাণী—'ভয় নাই, ওরে ভয় নাই'। সেই অভয়বাণীর অক্ষয় ভেলায় চড়ে পাড়ি দিতে চেয়েছি দুস্তর পারাপার।

কবিগুরুর আঁকা দুখানি চিত্র এই বইয়ে মুদ্রণের অনুমতি দিয়ে বিশ্বভারতী আমার এই বইয়ের গুরুত্ব অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছেন। ধন্যবাদ জানিয়ে সে ঋণ শোধ করা যায় না। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি তাঁদের সেই সহযোগিতা।

শ্রীনিশিকান্ত হাটই মহাশয় সযত্নে এবং দ্রুততার সঙ্গে এই বইয়ের প্রুফ দেখে দিয়ে আমাকে এই বই প্রকাশনে প্রভূত সাহায্য করেছেন। একথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ না করলে ভূমিকা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করার রীতি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। আমিও সেই রীতির অনুসরণে চিত্রশিল্পী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের শিল্পকর্মের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার মধ্য দিয়ে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে ধন্য হলাম।

রজনী কুটীর
১২৮, মাঝেরপাড়া,
ঠাকুরপুকুর
কলিকাতা-৬৩

বিনীত
শিবনাথ সরকার

সূচীপত্র

১

ছবি আঁকার সূচনা ঃ

এ পৃথিবীতে এমন এক একজন মনীষীর আবির্ভাব ঘটে যাঁরা আপন প্রতিভার আলোয় কালের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে সমকালের গণ্ডী পেরিয়ে মানুষের মনে চিরস্থায়ী আসন পেতে রাখেন। সে আসন সাহিত্য, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, দর্শন, চিত্র বা যে-কোনো বিষয়ের জন্য হতে পারে। যেমন বিজ্ঞানে ইতালির গ্যালিলিও, গ্রীসের আর্কিমিডিস, সঙ্গীতে বিটোফেন, দর্শনে গ্রীসের সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টোটল, সাহিত্যে ইংল্যাণ্ডের সেক্সপীয়ার আর চিত্রে মাইকেলেঞ্জেলো, লিয়োনার্দো-দা-ভিঞ্চি প্রমুখ ব্যক্তি। ভিন্ন ভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁদের প্রতিভা, সম্মান ও খ্যাতি শুধুমাত্র আপন আপন দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তা দেশ, কালের সীমানা পেরিয়ে সমগ্র পৃথিবীর মানুষের মনে অক্ষয় আসন পেতে নিয়েছে। এঁরা সকলেই এক একজন কিংবদন্তীর নায়ক হয়ে বেঁচে থাকবেন সভ্যতার শেষদিন পর্যন্ত।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এদের মাঝে এমন এক বিরল প্রতিভার মানুষ যাঁর মধ্যে বহু গুণের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই রবীন্দ্রনাথ যে একজন দক্ষ চিত্রশিল্পী ছিলেন, একথা আজও এদেশের অনেকের কাছে প্রায় অজানা রয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কবি। বাল্যকালে শিশুরা যখন ছাপার অক্ষর মুখস্থ করতে ব্যস্ত থাকে, সেই বয়সেই বালক রবীন্দ্রনাথ ছাপার উপযোগী কবিতা রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। বারো-তেরো বছর বয়সেই রবীন্দ্রনাথের রচনা পত্রিকায় প্রকাশ লাভ করতে থাকে। তাঁর এক ভাগিনেয় জ্যোতিপ্রকাশের উৎসাহে শান্ত, মৌন হিমালয়ের বুক চিরে গঙ্গা নেমে আসার মত রবীন্দ্রনাথের ভিতর থেকে কাব্যের স্রোত বইতে শুরু করল। সরস্বতীর আপন লেখনী যেন তাঁর হাতে উঠে এসে সাদা কাগজের দেহে অক্ষরের মালায় কথা কয়ে উঠল। এই মৌনতার মাঝে কথা বলেছেন তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত—প্রধানত কবি হিসেবেই।

রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রে একস্থানে লিপিবদ্ধ আছে—'কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী—বোধহয় যখন আমার রথীর মতো বয়স ছিল তখন থেকে আমার সঙ্গে বাক্‌দত্তা হয়েছিল। তখন থেকে আমাদের পুকুরের ধারে বটের তলা, বাড়ি-ভেতরের বাগান, বাড়ি-ভেতরের একতলার অনাবিষ্কৃত ঘরগুলো এবং সমস্ত বাহিরের জগৎ এবং দাসীদের মুখের সমস্ত রূপকথা এবং ছড়াগুলো, আমার মনের মধ্যে ভারী একটা মায়াজগৎ তৈরি করেছিল। তখনকার সেই আবছায়া অপূর্ব মনের ভাব প্রকাশ করা ভারী শক্ত; কিন্তু এই পর্যন্ত বেশ বলতে পারি কবি কল্পনার সঙ্গে তখন থেকেই মালাবদল হয়ে গিয়েছিল।...'সাধনা' লিখি আর জমিদারিই দেখি যেমনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি অমনি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে

প্রবেশ করি—আমি বেশ বুঝতে পারি এই আমার স্থান।···কবিতার্ কখনো মিথ্যা কথা বলিনে—সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থল।"

—শিলাইদহ। ৮ই মে ১৮৯৩

বিশ্বের দরবারেও রবীন্দ্রনাথ এই কবি হিসেবেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। এ প্রতিভা জন্মমুহূর্ত থেকেই রবীন্দ্রনাথের অস্থি, মজ্জার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। একদা অবলা বসুকে[১] এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লেখেন,—

···আমাকে যদি 'আপনি' বলা ছেড়ে দিয়ে 'তুমি' বলার চেষ্টা করে কৃতকার্য হতে পারেন তো উত্তম। যদি অসাধ্য বোধ করেন তবে পত্রে শ্রদ্ধাস্পদেষু প্রভৃতি বিভীষিকা প্রচার করবেন না। তার চেয়ে আমাকে আপনি 'কবিবরেষু' বলে লিখবেন।···

কিন্তু এটাই তাঁর প্রথম ও প্রধান হলেও শেষ পরিচয় নয়। তিনি একজন প্রখ্যাত নাট্যকার, ছোট গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে একজন নিপুণ চিত্রকরও বটেন।

জীবনের শেষ অধ্যায়ে এসে কবি কালি কলম ছেড়ে রং-তুলিতে হাত দেন। বস্তুত এই সময়টায় মানুষ জীবনের পাওয়া না পাওয়ার হিসেব নিকেশের মধ্যে নিমগ্ন থাকে। পরিণত জীবনে স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে কখন যে জীবন-সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ে তা কেউ জানতে পারে না। এটাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ তা চাননি। তিনি সেই বয়সেই জীবনকে অন্য খাতে বইয়ে নিয়ে গেলেন। দেহে তখন ভাটার টান। কিন্তু মনের জোয়ার তখনও যায়নি। মনের রং, মনের

---

১. বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সহধর্মিণী।

ছবি,মনের ভাব তখনও প্রকাশের অপেক্ষায় মনের দরজায় আঘাত হানছে বার বার :

> "বাহিরে পাঠায় বিশ্ব, কত গন্ধ গান দৃশ্য
> সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে
> বিরহী সে ঘুরে ঘুরে ব্যথাভরা কত সুরে
> কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে
> অন্তরে বাহিরে সেই ব্যাকুলিত মিলনেই
> কবির একান্ত সুখোচ্ছ্বাস
> সে আনন্দক্ষণগুলি তব করে দিনু তুলি
> সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ।"

দুর্বোধ্য ছবির জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনেকবার কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেসব সমালোচনায় ভ্রূক্ষেপ করেন নি, থেমেও যান নি। তিনি জানতেন, কোনো কিছু সৃষ্টির মূলেই রয়েছে আনন্দের প্রকাশ। এ আনন্দ নিছক আনন্দও হতে পারে আবার চরম দুঃখের মাঝে তাকে মন দিয়ে সহ্য করার প্রয়াসও হতে পারে। কিন্তু সেই আনন্দকে বাইরে প্রকাশ করতে না দিয়ে তার গলা টিপে ধরলে সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে স্রষ্টারও মৃত্যু ঘটে—দেহে না হোক, মনে।

সরসীলাল সরকারকে লিখিত পত্রে দেখি রবীন্দ্রনাথ বিধাতার রূপময় সৃষ্টির জগতের সঙ্গে নিজের রূপময় শিল্পজগতের তুলনা করেছেন—, অজানার স্বপ্ন উৎস থেকে বিচিত্র রূপ উৎসারিত—এ সম্বন্ধে বিশ্বকর্মার কোনো কৈফিয়ত নেই। আমার ছবিও তাই, রূপের নিগূঢ় আনন্দ নানা রঙে রূপে লীলা করছে। এই আনন্দ দর্শকদের মনে যদি সঞ্চারিত হয় তো ভালো—নইলে কারো কোনো ক্ষতি নেই। সৃষ্টি কেন হয় তার ব্যাখ্যা অসম্ভব—সকলের গোড়ার কথা হচ্ছে 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে'। (২৬শে ফাল্গুন, ১৩৩৮)।

প্রায় জীবনের সায়াহ্নে রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকায় বিশেষভাবে নজর দিলেও তাঁর বিভিন্ন স্বীকারোক্তি থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিনি এর আগেও মাঝে মাঝে ছবি আঁকতেন। কেননা, চিত্রকর্মের উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকতা অনেকদিন থেকেই তাঁর অনুকূল ছিল। অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-এর চিত্রানুশীলন, ভ্রাতুষ্পুত্র গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রেরণা প্রভৃতি কবিগুরুর কাব্য লেখাকে সার্থক চিত্র-রেখায় রূপান্তরের মানসিক প্রস্তুতির পথে সাহায্য করেছিল বহুলাংশে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'My Picture' প্রবন্ধের প্রায় শুরুতেই লিখছেন—···'Oriental tradition, was started by my nephew Abanindranath. I watched his activities with an envious mood of self-diffidence, being thoroughly convinced that my fate had refused me passport across the strict boundries of letters. July 2, 1930

Chittralipi 2

তাছাড়া প্রথম জীবনে তাঁর প্রাথমিক চিত্রাঙ্কন প্রচেষ্টার কথা তিনি নিজেই বলে গেছেন জীবনস্মৃতিতে—"দুপুর বেলার জাজিম বিছানো কোণের ঘরে একটা ছবি আঁকার খাতা লইয়া ছবি আঁকিতেছি। সে যে চিত্রকলার কঠোর সাধনা তাহা নহে—সে কেবল ছবি আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপনমনে খেলা করা।"

এ সম্পর্কে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর জবানবন্দী কিছুটা তুলে ধরা যেতে পারে। তিনি তাঁর 'রবীন্দ্রস্মৃতি' নামক বইতে লিখছেন—'কাব্যের সঙ্গে শিল্প স্বভাবতই জড়িত। কিন্তু রবিকাকা অনেক বয়সে শিল্পলক্ষ্মীর আরাধনা শুরু করেছেন, কাজেই আমার সে বিষয়ে ছেলেবেলাকার বিশেষ কোন স্মৃতি নেই। তবে তাঁর যে আঁকবার

স্মৃত আছে, তার পরিচয় আমরা ছেলেবেলা থেকেই পেয়েছি। জ্যোতিকাকা মশায়ের মতো পেনসিলে প্রতিকৃতি আঁকায় পারদর্শী না হলেও আর অত খ্যাতি অর্জন না করলেও তিনি পেনসিলে কারো কারো ছবি এঁকেছেন বলে মনে পড়ে। ১৮৯২ সালে আমরা দীর্ঘ দিন ধরে সিমলা পাহাড়ে থাকি। সেই সময় কলকাতার ৫ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর গলির সঙ্গে সিমলার উড ফিল্ড বাড়ির যে হেঁয়ালি চিত্র বিনিময় চলত তার নমুনা এখনো রবীন্দ্রসদনে আছে।…রবি কাকার হাতেরও কতকগুলি হেঁয়ালি চিত্র এতে আছে। হেঁয়ালি রচনাতেও তাঁর স্বাভাবিক মৌলিকতা যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি এইসব পেনসিলে আঁকা ছবিতেও তাঁর ভবিষ্যৎ চিত্রকলা সাধনার সংকেত ধরা পড়ে।

জোড়াসাঁকোর ৫ নম্বর আর ৬ নম্বরের দুই বাড়ি সরস্বতীর চিত্রকলা আর সঙ্গীতকলার দুই দিক ভাগ করে নিয়েছিল। ৬ নম্বর বাড়িতে যেমন প্রতি ছেলেমেয়ে হারমনিয়ম বাজিয়ে একটা গান গাইতে পারতেন না তা নয়, তেমনি ৫ নম্বরেও প্রত্যেকেই ছোটবেলা থেকে রেখার আঁচড় আর রঙের পোঁচ দিতে পারতেন।…রবিকাকা সম্বন্ধেও এ কথা খাটে।”

ইন্দিরা দেবীর বক্তব্যের জোরালো সমর্থন পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের এক পকেট বই থেকে।

১৮৮৯ সালের সেই পকেট বইতে লুকিয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের জীবনের বহু পরিচয়। এতে আছে তাঁর রচিত বহু গান, কবিতা, ছবি ডায়েরী ও নানান হিসাবপত্র। তিনশ’ পৃষ্ঠার এই পকেট বইয়ের প্রত্যেক পাতা বিস্ময়, বেদনা ও সৃষ্টির যন্ত্রণায় ভরা।

তখন তিনি তরুণ জমিদার। ১৮৮৯ সালে তাঁর বয়েস মাত্র আটাশ। সেই সময় থেকেই তিনি যে ছবি আঁকায় খুব উৎসাহী ছিলেন তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

জমিদারী হিসেব রাখার জন্য যে খাতা আনা হোলো তাতেই দিনে দিনে লেখায় ও রেখায় ভরে উঠতে লাগল। কোনো পাতার শুরুতে লিখেছেন—

কটকে বলুর[১] জুতো—৬ টাকা ৪ আনা

আমার জুতো—৫ টাকা ১২ আনা।

কবি গামছা কিনেছেন—১ টাকা ৩ আনা দিয়ে এবং চেনা কেউ পুরীর সমুদ্রে ডুবুডুবু হয়েছিল, তাই "লোক উদ্ধারের জন্য বকশিস—৫ টাকা।" এই হিসেব কেটে দিয়ে উপরে এঁকেছেন এক 'ছন্দোময়ী কৃষ্ণাঙ্গীর মূর্তি।

এমনি হিসেবের ঠিক নীচেয় হয়তো পাওয়া যাবে একটা কবিতা বা গান। কাটাকুটির মাঝে ছবি আঁকার শুরু বোধহয় তখন থেকেই। গান বা কবিতার মধ্যেই ফুটে উঠেছে এক একটি ছবির রূপ।

'যা কিছু দূরে গিয়েছে ছেড়ে
টেনেছে তারই গানে'......

এই গানের মধ্যেই কাটাকুটির ভিতর দিয়ে অদ্ভুত নামহীন ছবি ফুটে উঠেছে। আর এক পাতায় হিজিবিজির মাঝখানে দুটি নারীর মুখ আঁকা।

"আমি চিনিগো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী
তুমি থাক সিন্ধুপারে—ওগো বিদেশিনী
তোমায় দেখেছি শারদ প্রাতে, তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে
তোমায় দেখেছি হৃদি মাঝারে—ওগো বিদেশিনী"......

এক সিন্ধুপারের বিদেশিনীকে স্মরণ করে এই গান লিখেছেন, কিন্তু লেখার শুরুতেই এর প্রথম লাইন কেটে দিয়ে আঁকেন চুলখাড়া

---

১ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর—রবীন্দ্রনাথের ভাইপো।

মুয়া স্বদেশী পুরুষের এক মুখ। শুধু মুখই নয়, পাতার কোণাতেও সুন্দর করে নক্শা এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ।

সব সমেত ৯০টি গানের খসড়া আছে পকেট বইয়ে। খসড়া বলছি এই কারণে, অনেক গানের সুরু আছে শেষ লেখা নেই। এতে কয়েকখানি হিন্দী ভাঙ্গা গান আছে, আবার হিন্দী গানের বাংলা রূপান্তর আছে।

কিন্তু সবকিছুর মাঝে উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে শিল্পী রবীন্দ্রনাথের এক নতুন রূপ, নতুন সত্তা।

পকেট বইয়ের তিন নম্বর পৃষ্ঠায় সমস্ত পাতা জুড়ে তিনি এঁকেছেন ঠোঁট লম্বা ছুটো পাখির ছবি। পেনসিলে আঁকা এই ছবি দেখে সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করবেন পাকা হাতের কাজ বলে। তখন থেকেই তাঁর হিসেব পত্রে, চিন্তা ভাবনায়, গান-কবিতার ফাঁকে বারে বারে কতকগুলি ছবির মুখ ভেসে উঠত। আর তাদের তিনি সযত্নে তখনই ধরে রাখতেন যে-কোনো কাগজের উপরে।

এমনি করে গান কবিতা, জমিদারী হিসেবের মাঝে জন্ম নিয়েছে একে একে বহু নাম-গোত্র-হীন রূপ, মুখ ইত্যাদি।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর উক্তি স্বীকার করে নিয়ে একথা জোর দিয়ে বলা চলে মোটামুটি ১৯২৬ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথকে ছবি আঁকার নেশায় রীতিমত পেয়ে বসে এবং আশ্চর্যের কথা বছর বারো-তেরোর মধ্যে তিনি প্রায় তিন হাজারের মতন ছবি আঁকেন।

এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্য বিখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসু লেখেন—"প্রায় দশ-বারো বছরের মধ্যেই যে সব ছবি কবি এঁকেছেন, তার সংখ্যা গত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশে সমস্ত নামকরা চিত্রশিল্পীরা মিলে যত ছবি এঁকেছেন—তার চেয়ে বেশী।

সাধারণতঃ শিল্পীরা ছবি আঁকার প্রেরণা পান দু' ভাবে। প্রথমতঃ বাইরের কোনো দৃশ্য যখন মনের মধ্যে রং ধরায় তখন তাকেই রূপদান
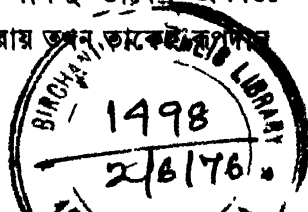
করেন শিল্পী। অন্যদিকে শিল্পীর মনের মধ্যে যে সব ভাবনা আকুলিত হয় তাকে শিল্পী রূপ দেন চিত্রে, ভাস্কর্যে এমনকি স্থাপত্যে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের ছবির সৃষ্টি এই দুই ধারার সম্পূর্ণ বাইরে। তিনি আঁকার শুরুতে লেখার মধ্যে কাটাকুটি করতে করতেই এক একটা নতুন রূপ গড়ে তুলতেন। সে ছবি আঁকার খেলার মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য থাকত না। অর্থাৎ তাঁর সচেতন মনের মধ্য দিয়ে তারা ফুটে উঠত না। ফুটে উঠত তারা অবচেতন মনেই।

প্রখর দৃষ্টি, নিপুণ পর্যবেক্ষণ, দৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে একাত্মতা এবং মনের জমিতে তার পুনর্মুদ্রণ রবীন্দ্রনাথকে এগিয়ে দিয়েছে অনেকখানি। এক বিদেশী সমালোচক ঠিকই বলেছিলেন—'Don't study, only see and enjoy.' নিজের ছবি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ছন্দোবদ্ধ মন্তব্যটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—

'টুকরো যত রূপের রেখা, সঞ্চিত হয় মনের চিত্রশালে
কখন ছবির আকার নিয়ে জোড়া লাগায় শিল্পকলার জালে।'

লেখার মধ্যে যে অংশ বাদ দিতেন তাকে এমনভাবে কাটাকুটি করতেন যেন তার মধ্য দিয়ে পুরোনো শব্দ কারো নজরে না আসে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলতেন—'যে সব লেখার মৃত্যু ঘটিয়েছি তাদের তো সুন্দরভাবে কবর দেয়া চাই'। (I must give them a decent burial.)

লিখতে বসে খাতার পাতায় কাটাকুটি একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। সেটা দৃষ্টিদানের পক্ষে অনাবশ্যক বলেই উপেক্ষণীয়। কিন্তু কবির ক্ষেত্রে ঘটল ব্যতিক্রম।

—"আমার হাতের লেখার কাটাকুটিগুলোর সামাঞ্জস্যহীন কুৎসিত রূপ আমার চোখে পীড়া দিত এবং মনে হতো যেন পাপীদের মতই তারা মুক্তির জন্য আর্তনাদ করছে। তাই প্রায়ই আমি আমার আসল

কাঁজ ছেড়ে দয়াপরবশ হয়ে এদের নিয়ে বসতাম। এইভাবে এদের পেছনে অনেক সময় ব্যয় করেছি"।

কাজের মধ্যেও যে আত্মার মুক্তি আছে, আনন্দ আছে, রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন তাঁর ছবি আঁকার মধ্য দিয়ে। তিনি সহাস্যে বলতেন—'যাক্, অবশেষে একটা কিছু পাওয়া গেল যেখানে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে কাজ করতে পারব'।

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমগ্র রচনা, সমগ্র সৃষ্টি সর্বসাধারণের কাছে যেন কুয়াশায় ঢাকা দূরের বিশাল শৃঙ্গ বলে মনে হয়। তাঁর রচনা ভাবের দিক দিয়ে, ভাষার দিক দিয়ে এমন উচ্চ মানের যে, সাধারণের মনের কাছে তা সহজে ধরা দেয় না। রবীন্দ্রনাথের ছবির সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। যদিও তিনি জানতেন—'এদেশের লোক ছবি দেখতে জানে না, আগে দেখে মুখটা সুন্দর কিনা এবং পরিচিত পরিবেশের সঙ্গে ছবির প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে কিনা।'

—"Most people do not or cannot use their eyes well. They go about their own little business. The artist has a call and must answer the challenge to compel the unperceptive majority to share in his joy of the visible, concrete world—directly perceived. He sings not, nor does he moralise. He lets work speak for itself and its message is ; Look, this is what I am, Ayamaham bho."

from Tagore on Art and Aesthetics,
Orient Longmans, 1961.

এসব জেনেও সকলের বোঝার সুবিধার জন্য তাঁর আঁকা ছবিতে নাম দিতে তিনি রাজি থাকতেন না। তিনি এ ব্যাপারে বলতেন—'ছবিতে নাম দেয়া একেবারে অসম্ভব। তার কারণ আমি কোনো বিষয়

ভেবে আঁকিনি—দৈবক্রমে একটা কোনো অজ্ঞাতকুলশীল চেহারা চলন্তি কলমের মুখে খাড়া হয়ে ওঠে, জনকরাজার লাঙলের ফলার মুখে যেমন জানকীর উদ্ভব। একটিকে সহজে নাম দেয়া যায়, কিন্তু আমার যে অনেকগুলি—তারা অনাহুত এসে হাজির—রেজিস্টার দেখে নাম মিলিয়ে নেব কোন্ উপায়ে। জানি রূপের সঙ্গে নাম জুড়ে না দিলে পরিচয় সম্বন্ধে আরাম বোধ হয় না। তাই আমার প্রস্তাব এই, যাঁরা ছবি দেখবেন বা নেবেন তাঁরা অনামীকে নিজেই নাম দান করুন।"

'রবিঠাকুরের ছবি' প্রবন্ধে এক জায়গায় পূর্ণেন্দু পত্রী প্রশ্ন রেখেছেন—"কাটাকুটির সেই গোড়ার পর্ব থেকে রঙে আঁকা ছবির পথ তো সুদীর্ঘ। এতখানি দীর্ঘ পথ একটানা এবং অব্যাহত হেঁটে আসার মূল প্রেরণা কি? এরই পাশাপাশি আরও এক প্রশ্ন, আজীবন যা সুন্দর যা মধুময় বলে জেনেছেন তারই দিক থেকে হঠাৎ শেষ জীবনে 'যা পরুষ, যা নিষ্ঠুর, 'যা উৎকট' তার দিকে এমন নিবিড় চোখে ফিরে তাকালেন কেন। কেন তাঁর ছবির জগতে এত অন্ধকার, পাখির চোখে সাপের চাউনি, সাপের শরীরে নারীর লাবণ্য, নারীর মুখে অচরিতার্থ কামনার নীরব আর্তনাদ[১]? কেন মনে হয় তাঁর ছবির জগতের জন্তুরা বড় বিকট, বীভৎস, কঠিন, নির্দয় এবং ক্রূর। যেন তারা আদিম প্রাণী-জগতেরও আদিমতম পূর্বপুরুষ।"

এই সনাতন প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প' শীর্ষক গ্রন্থে। তিনি এখানে একস্থানে লিখছেন—"বৃদ্ধ বয়সে সজ্ঞান চেতনার মুষ্টি শিথিল হইলে অনেক সময় এমন হইয়া থাকে। সচেতন মনের মতো অবচেতন মনেরও একটা দাবি আছে। বৃদ্ধ বয়সে সাধারণ দাবি ছাড়া রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আরও একটা কারণ ঘটিয়াছিল। ১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথের যে কঠিন পীড়া হইয়াছিল,

---

১ রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রকর' গল্প লক্ষ্যণীয়।

সেই সময়ে লুপ্তচৈতন্য অবস্থায় অবচেতন মনে অবগাহনের যে অভিজ্ঞতা তাঁহার ঘটিয়াছিল, সেটাও একটা কারণ বলিয়া মনে হয়। এই পীড়ার পরে 'প্রান্তিক' কাব্যের অধিকাংশ কবিতা লিখিত।"

'রঙ্গমঞ্চে একে একে নিবে যবে গেল দীপশিখা……
দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলি-বেলায়
দেহ মোর ভেসে যায়
কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি
নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ।……
মৃত্যুদূত এসেছিল হে প্রলয়ঙ্কর, অকস্মাৎ
তব সভা হ'তে। নিয়ে গেল বিরাট প্রাঙ্গণে তব,
চক্ষে দেখিলাম অন্ধকার।"

—শান্তিনিকেতন। ৮।১২।৩৭

রবীন্দ্রনাথের শিল্প ক্ষেত্রে অবচেতনের আকস্মিক অভ্যুদয় ঘটেছে। তার পূর্বতন রচনা উচ্চেতনামূলক, তার লক্ষণ শান্তি, সংযম ও শালীনতা। এসবের পরিবর্তে অধীরতা ও উদ্দামতার বিকাশ তাঁর ছবিগুলিতে দেখা যায়। কিম্ভূতকিমাকার জন্তু-জানোয়ার, পাখী, মানুষের মুখ তিনি অনেক এঁকেছেন। অথচ সেসব জন্তু-জানোয়ার ও উদ্ভিদ সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার বাইরে।

২

ছবি আঁকার প্রেরণা

প্রেরণা স্রষ্টার মনে সৃষ্টির উন্মাদনা জাগিয়ে তোলে, স্রষ্টা সেই উন্মাদনায় সৃষ্টির নেশায় মেতে ওঠেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠিক কবে থেকে আঁকার কাজে মনোনিবেশ করেন সে বিষয়ে কিছু মতভেদ আছে। তাঁর পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী লেখেন—"বোধহয় ১৯২৭-এ তিনি তুলির কাজ বা কলমের মুখ দিয়ে রেখাঙ্কন সুরু করেন। বহুকাল পরে পাণ্ডুলিপির খাতায় লেখা—কাটাকুটির ছলে এই আঁকা-জোঁকার কাজে মন দেন। এই রকম অনেকদিন ধরে লেখার সঙ্গে আঁকার সময় তাঁর মন ডানা ছড়িয়ে অবাধে কল্পনালোকে ঘুরতে পারত। লেখার মাঝে সময়টুকু তাঁর চিত্তকে চিন্তা করবার অবকাশ দিত।......

বস্তুতঃ এমনি করেই তাঁর লেখা, কাটাকুটিব খেলা একদিন চিত্র-জগতের দ্বারে এসে ঘা দিল।"

(বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা)।

অন্যদিকে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মাদাম ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর অতিথি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ যখন তিন মাস আর্জেন্টিনায় কাটাতে বাধ্য হন, সে সময় একদিন মাদাম ওকাম্পোই নাকি ছবি আঁকার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করেন। ১৯৭০ সালের ৯ই মে তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকা এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে।

একদিন কথায় কথায় শ্রীমতী ওকাম্পো জ্যোতির্ময় মৌলিক মহাশয়কে বললেন—জানিস, রবীন্দ্রনাথ কোথায় ছবি আঁকা শুরু করেন?

—জানি, তোমার বাড়ীতে।

—তাহলে এটাও নিশ্চয় জানিস যে, কবি তাঁর পাণ্ডুলিপির প্রচুর পরিবর্তন এবং সংশোধন করতেন ছাপাখানায় পাঠাবার আগেই।

—হ্যাঁ, জানি।

—এ অভ্যেস তাঁর অনেক দিনের, শ্রীমতী ওকাম্পো পুনরায় বললেন, কিন্তু কোনো সময় তিনি তাঁর পাণ্ডুলিপি কেটেকুটে অসুন্দর করে তুলতেন না। কলমের ডগা দিয়ে নানা রকম পক্ষী-পাখালী বা কোনো অতিকায় কাল্পনিক প্রাণীর মুখের চেহারা ফুটিয়ে তুলতেন।

মিরালরিয়াতে যখন তিনি কবিতা লিখতেন, তখনও তাঁর পাণ্ডুলিপিতে ঐসব দেখেছি। তখন আমি ঐ অঙ্কনের মধ্যে তাঁর একটা বিরাট অঙ্কনশক্তি আবিষ্কার করেছিলাম।

ওঁর একটা ছোটো খাতা টেবিলে পড়ে থাকত, ওরই মধ্যে কবিতা লিখতেন বাঙলায়। বাঙলা বলেই যখন তখন খাতাটা খুলে দেখা আমার পক্ষে তেমন দোষের ছিল না। এই খাতা আমাকে বিস্মিত করল, মুগ্ধ করল।

তাঁর লেখার মধ্যে আঁকিবুকি থেকে বেরিয়ে আসত সব রকম মুখ, প্রাগৈতিহাসিক দানব, সরীসৃপ অথবা নানা আবোল-তাবোল। একদিন কাকুতি করে বললাম, এর কয়েকটি পৃষ্ঠার ছবি তুলতে দিতে হবে আমায়।

আমাকে খুশী করবার জন্ত রাজী হলেন। এই ছোটো খাতাটিই হ'লো শিল্পী রবীন্দ্রনাথের সূচনাপর্ব। সান ইসিদ্রোর ছ' বছর পর প্যারীতে যখন দেখা হোলো কবির সঙ্গে, ওঁর ওই খেলা তখন দাঁড়িয়ে গেছে ছবিতে।

সেদিন কবিকে চিত্রাঙ্কনে মনোনিবেশ করতে প্রচুর উৎসাহ দিয়েছিলাম। কবি চুপ করে আমার কথা শুনলেন, কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না। এর কয়েকদিন পর তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন—'বিজয়া, উৎসাহে আমি এ কাজে প্রবৃত্ত হব। তবে তুলি দিয়ে আমি ছবি আঁকবো না। কলম দিয়েই তুলির কাজ নিষ্পন্ন করবো। যে কলম দিয়ে কথার কাব্য লিখি, সেই কলমে রং এবং রেখার কাব্য লিখতে পারি কিনা, তারই একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে চাই।'

ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো রবীন্দ্রনাথকে যে কত শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন তা তাঁর কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৩০ সালে প্যারীতে রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে যে প্রদর্শনী হয় তার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করেছিলেন ভিক্টোরিয়া নিজে। ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর Sur পত্রিকায় রবীন্দ্র প্রসঙ্গে লেখেন, বক্তৃতা দেন সভায়। ১৯৫৮ সালে লেখেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তাঁর দীর্ঘতম রচনা। Sur পত্রিকার পক্ষ থেকে সেই লেখা বই হিসেবে ছাপা হলো ১৯৬১ সালের মে মাসে :

"Tagore en las barrancas de San Isidra."

ভিক্টোরিয়াই উৎসাহ নিয়ে ১৯৬১ সালে সান ইসিদ্রোর একটি রাস্তার নাম করালেন রবীন্দ্রনাথের নামে : 'আদেনিদা তাগোরে'।

ডাকবিভাগ থেকে বের হল তাঁর নামে বিশেষ স্ট্যাম্প। শতবর্ষ অনুষ্ঠানে আয়োজিত ৭ই মে'র জনসভায় ভাষণ দিলেন ভিক্টোরিয়া। স্পেনীয় ভাষায় 'ডাকঘর' অভিনয় হলো (৩১শে মে) মাদামের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে।

"ওকাম্পোর ভক্তি, শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা ও আতিথেয়তায় কৃতজ্ঞ অন্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বহুবার বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন। তিনি শত খ্যাতির মাঝেও ওকাম্পোকে ভোলেন নি—পরন্তু, তিনি অসঙ্কোচে স্বীকার করেন—"ভিক্টোরিয়া যদি না থাকত তাহলে ছবি ভালোই হোক, মন্দই হোক, কারো চোখে পড়ত না। একদিন রথী ভেবেছিল ঘর পেলেই ছবির প্রদর্শনী আপনি ঘটে, অত্যন্ত ভুল। এর এত কাঠখড় আছে যে আমাদের পক্ষে অসাধ্য—আন্দ্রের পক্ষেও। খরচ কম হয়নি—তিন্-চারশো পাউণ্ড হবে। ভিক্টোরিয়া অবাধে আমার জন্য টাকা ছড়াচ্ছে। এখানকার সমস্ত বড়ো বড়ো গুণী-জ্ঞানীদের ও জানে—ডাক দিলেই তারা আসে।…ভিক্টোরিয়া ছবি বিক্রির কথা বলছিল—বোধহয় এই উপলক্ষ্যে নিজে কিনে নেবার ইচ্ছা। আমি বলেছি এখন বেচবার কথা বন্ধ থাক।…ভিক্টোরিয়া স্থির করেছে এখানকার একজন বড়ো ডাক্তারকে দিয়ে আমায় পরীক্ষা করাবেন।… ওঁর আমেরিকা যাবার তাড়া। কেবল আমার এই ছবির জন্যই আছে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থখানি বিজয়ার নামে উৎসর্গ করেন। বিজয়া নামটিও তাঁরই দেয়া। তাকে এক পত্রে লেখেন,— 'পূরবীর কবিতাগুলি যারা পড়বে, তারা জানতেও পারবে না তোমার প্রতি কত তাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।'

রবীন্দ্রনাথের অন্তরের এই কথা ব্যক্ত হয়েও আমাদের অনেকের কাছেই তা অব্যক্ত রয়ে গেছে আজও।

প্রতিমা দেবী বা শ্রীমতী ওকাম্পো যে সালের কথা উল্লেখ করেছেন তাতে তর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু তর্কের মধ্যে না এসেও বলা যায় তাদের উল্লিখিত সালের মধ্যে যে-কোনো এক সময় রবীন্দ্রনাথ নিজের মনের খেয়ালে ছবি আঁকায় ব্রতী হন। কেননা স্রষ্টার সৃষ্টি কখনও কোনো সন, তারিখ বা তিথির অপেক্ষা রাখে না। সেটা

স্রষ্টার হৃদয় থেকে কখন যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঝর্ণার মত উচ্ছল বেগে বেরিয়ে পড়ে তা অনেক সময় স্রষ্টার নিজেরই হিসেব থাকে না। আর এ চিন্তাও তখন মনে ঠাঁই পায় না যে, এ সৃষ্টি কালের ভ্রূকুটি এড়াতে পারবে কিনা।

রবীন্দ্রনাথের আঁকা বেশ কিছু ছবিতে একই ধরনের চোখের গড়ন, চোখের ভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলতেন—"নতুন বৌঠানের (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী, রবীন্দ্রনাথের বৌদি) চোখ দু'টো এমনভাবে আমার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে গেছে যে, মানুষের ছবি আঁকতে বসলেই অনেক সময়ই তাঁর চোখ দুটো আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করতে থাকে—কিছুতেই ভুলতে পারিনে। তাই ছবিতেও বোধহয় তাঁর চোখের আদল এসে যায়।"

কাদম্বরী দেবী রবীন্দ্রনাথের জীবনে যে কত বড় অংশ জুড়ে ছিলেন তা রবীন্দ্রানুরাগী মাত্রেই জানেন। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একাধারে স্নেহময়ী বৌদি, মা, সাহিত্যের সমঝদার শ্রোত্রী ও উৎসাহদাত্রী।

মাকে রবীন্দ্রনাথ খুব অল্প বয়সে হারান। তখন সে হারানোর বেদনা পুরোপুরি উপলব্ধি করার বয়স হয়নি। তাই মাতৃস্নেহ থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন প্রায় জীবনের শুরু থেকে।

বাবা দেবেন্দ্রনাথ বছরের অধিকাংশ সময় কাটাতেন পাহাড়ে পর্বতে ও বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে। রবীন্দ্রনাথের বিবাহের সময়ও তিনি ছিলেন অনুপস্থিত।

এইরকম অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের জীবনে নতুন বৌঠান এলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন স্নেহ, মায়া, মমতা আর ভালোবাসার অসীম ভাণ্ডার। সে ভাণ্ডার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দু'হাতে শুধু তাঁকে দিয়ে গেছে স্নেহ, সম্মান আর দেখিয়েছে প্রতিষ্ঠার প্রশস্ত পথ। নতুন বৌঠান ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রথম শ্রোত্রী, প্রথম সমালোচক। তাঁকে উদ্দেশ্য করেই রবীন্দ্রনাথ লেখেন—"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা"।

বহু কবিতার বই কাদম্বরী দেবীকেই উৎসর্গ করা। 'ছবি ও গান' বইয়ের উৎসর্গ পত্রে লেখেন—"গত বৎসরকার বসন্তের ফুল লইয়া এ বৎসরকার বসন্তে মালা গাথিলাম। যাহার নয়নকিরণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি একটি একটি করিয়া ফুটিত, তাহারি চরণে উৎসর্গ করিলাম।"

মাত্র ২৫ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের এত কাছের, এত আদরের বৌদি মৃত্যুর পরপারে চলে গেলেন। এ দুঃখ রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত স্মরণ করেছেন। "শৈশব সংগীত" বইয়ের উৎসর্গে লেখেন—'বহুকাল হইল তোমার কাছে বসিয়া লিখিতাম, তোমাকে শুনাইতাম। এই সমস্ত স্নেহের স্মৃতি ইহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। তাই মনে হইতেছে তুমি যেখানেই থাক না কেন, এ লেখাগুলি তোমার চোখে পড়িবেই'।

বাল্মীকির জীবনে শোকই শ্লোকের রূপ নিয়ে এসেছিল আর সেই শ্লোকই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়েছিল। তিনি হয়েছিলেন ভারতের কবিকুলচূড়ামণি। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও সেইরকম। বৌঠানের শোকে তাঁর হৃদয় মন্থন করে উঠে এসেছিল 'পুষ্পাঞ্জলি' নামক গদ্য কবিতাগুচ্ছ। এখানে তিনি লেখেন—'হে জগতের বিস্মৃত আমার চিরবিস্মৃত, আগে তোমাকে যেমন গান শুনাইতাম, এখন তোমাকে তেমন শুনাইতে পারি না কেন। এসব লেখা যে তোমার জন্যই লিখিতেছি। পাছে তুমি আমার কণ্ঠস্বর ভুলিয়া যাও, অনন্তপথে চলিতে চলিতে যখন দৈবাৎ তোমাতে আমাতে দেখা হইবে তখন স্মরণ করিয়া আমার এই লেখাগুলি তোমাকে বলিতেছি, তুমি কি শুনিতেছ না। এমন একদিন আসিবে যখন এই পৃথিবীতে আমার কথার একটিও কাহারও মনে থাকিবে না। কিন্তু ইহার একটি-দুটি কথা ভালোবাসিয়া তুমিও কি মনে রাখিবে না। যেসব লেখা তুমি এতো ভালোবাসিয়া শুনিতে, তোমার সঙ্গে আর কি তাহাদের কোন সম্বন্ধ

নাই। এত পরিচিত লেখার একটি অক্ষরও মনে থাকিবে না? তুমি কি আর এক দেশে আর এক নতুন কবির কবিতা শুনিতেছ?

কৈশোর যৌবনের সেই দিনগুলি—হাসি, কান্না, আনন্দ, বেদনায় ভরা—কতকাল আগে তাদের চলতি পথের পাশে ফেলে এসেছেন তার হিসেব নেই। এর মাঝে আরো কত মানুষ, কত দেশ, কত ঘটনা এসে স্মৃতির বোঝা বাড়িয়েছে। আজ জীবনের পড়ন্ত বেলায় ওপারের পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির অত ভিড়ের মাঝ থেকেও সযত্নে আপন চোখের সামনে উঠে আসে একটি মুখ। ছায়া ছায়া নারীমুখ। সে মুখের দুটি চোখ সলজ্জ কৌতুকে, আনন্দে চোখে চোখ রেখে কথা কইছে আজও। ভাষায় যে মুখের, যে রূপের, যে প্রাণের বর্ণনা দিয়েছেন বহু কাব্যে, আজ তাকেই তুলিতে নতুন করে প্রকাশ করলেন পাতায় পাতায়।

আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গান-চর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল,—জীবনস্মৃতি।

শুধু গানই নয়, চিত্রাঙ্কনও অল্পবয়স থেকে রবীন্দ্রনাথের মজ্জায় মিশে গিয়েছিল।

তা হওয়াই হয়তো স্বাভাবিক।

যে পরিবারে জগৎজোড়া শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতির মত ব্যক্তিরা জন্মগ্রহণ করেন, সে পরিবারের সে হাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ যে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারবেন না তা হতেই পারে না।

রবীন্দ্রনাথ শুধু চিত্রাঙ্কনেই শিল্পী নন, তিনি জন্মগ্রহণ করেন এক শিল্পীমন নিয়ে। সে শিল্পীমনের অঙ্কুর দিনে দিনে বেড়ে ওঠে অনুকূল পরিবেশের মধ্যে থেকে।

রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকা নিয়ে একটা গল্প আছে শোনা যায়। একবার পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী কবিকে তাঁর ছবি আঁকা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন। রবীন্দ্রনাথ এর উত্তরে তাঁকে সহাস্যে বলেন—"সরস্বতী প্রথমে আমাকে নিজের লেখনীটি দয়া করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবার পর ভাবলেন, না, কাজটা সম্পূর্ণ হয় নি, সম্পূর্ণ করতে হবে। এই ভেবে তিনি নিজের তুলিকাটিও আমাকে প্রদান করলেন।"

ফ্রান্সের মনীষী রোম্যা রলাঁ বলেছিলেন—রবীন্দ্রনাথের শেষের বছরগুলি কাটছিল মস্ত দুঃখে। নিজেকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যই উনি মন দিয়েছিলেন ছবি-আঁকায়।

......"সবচেয়ে কি কষ্ট হয় জানো, যে এমন কেউ নেই যাকে সব বলা যায়। সংসারে কথার পুঞ্জ অনবরত জমে উঠতে থাকে—ঠিক পরামর্শ নেবার জন্য নয়, শুধু বলা, বলার জন্যই। এমন কাউকে পেতে ইচ্ছে করে যাকে সব বলা যায়,—সে তো আর যাকে তাকে দিয়ে হয় না। যখন জীবনের এই চলেছে, কাজের বোঝা জমে উঠছে, মেয়ে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তখন এইটেই সবচেয়ে কষ্ট হোতো"।......

—রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতেও রবীন্দ্রনাথের এই ধরণের দীর্ঘশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে—

কল্যাণীয়েষু, দার্জিলিং।

......"আমি মানুষটা বড় একা। নিজে নিজে চিন্তা করি, চেষ্টা করি, লেখায় প্রকাশ করি কিন্তু কাউকে চালনা করতে পারিনে।"......

রবীন্দ্রনাথ ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকতেন। এ ব্যাপারে প্রমাণের অভাব নেই। 'ছিন্নপত্রে'র একস্থানে তিনি লিখেছেন,—খুব অল্প বয়সে যখন জ্যোতিদাদার সঙ্গে শিলাইদহে যান তখন তিনি পদ্মার প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকবার জন্য খাতা পেনসিল নিয়ে তীরে বসে থাকতেন। কিন্তু একথা ছেড়ে দিলেও প্রশ্ন উঠতে পারে, তিনি হঠাৎ

শেষ বয়সে অমন করে ছবি আঁকায় মন দিলেন কেন? আর আঁকতে বসে অত সংযম ও সঙ্গে সঙ্গে অস্থিরতা প্রকাশ করতেন কেন?

এই সঙ্গে আরো অনেক 'কেন'র যথাযথ উত্তর পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বা গল্প-উপন্যাসে নয়, তাঁর লেখা চিঠিপত্র ও স্মৃতিকথার মধ্যেই।

দিলীপ রায়কে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন,—"বস্তুতঃ ছবি আঁকাটাই আমার বাণপ্রস্থ—মন ওর মধ্যে আপনাকে হারায় অথচ পায়ও। যে সৃষ্টিকর্তার কর্তব্যের দায় নেই, যিনি যুগ ,যুগান্তর খেলা করে কাটান, শেষ বয়সে আমি তাঁরই চেলা হতে ইচ্ছা করি"।

"জগতে রূপের আনাগোনা চলছে।
সেই সঙ্গে আমার ছবিও এক-একটি রূপ,
অজানা থেকে বেরিয়ে আসছে জানার দ্বারে।
সে প্রতিরূপ নয়।
মনের মধ্যে ভাঙ্গাগড়া কত কতই জোড়াতাড়া;
কিছু বা তার ঘনিয়ে ওঠে ভাবে,
কিছু বা তার ফুটে ওঠে চিত্রে,
এতদিন এই-সব আকাশবিহারীদের ধরেছি কথার ফাঁদে।...
আজকাল আছে সে চোখ মেলে।
রেখার বিশ্বে খোলা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে দেখবে ব'লে।
সে তাকায়, আর বলে, 'দেখলেম'। —শেষসপ্তক।

শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লেখেন।

......'বহুদিন আমার নেশার দুই মহল ছিল বাণী এবং গান। শেষ বয়সে তার সঙ্গে আর একটা এসে যোগ দিয়েছে—ছবি। মাতানের মাত্রা অনুসারে বাণীর চেয়ে গানের বেগ বেশি, গানের চেয়ে ছবির। যাই হোক এই লীলাসমুদ্রেই আরম্ভ হয়েছে আমার জীবনের আদি মহাযুগ—১৪ জুন ১৯৩১।

নন্দলাল বসুর আঁকা বেশ কিছু ছবির উপরে রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা করেন। সেইসব ছবি রবীন্দ্রনাথকে কবিতা রচনায় অনুপ্রেরণা জাগিয়েছিল। ছবিগুলির অন্তরের ভাষা তিনি ফুটিয়েছিলেন কাব্যের মধ্য দিয়ে। পরে এগুলো একত্রে বই আকারে প্রকাশ পায়। নাম নেয় 'ছড়ার ছবি'।

বিভিন্ন চিঠিপত্রের সাহায্যে প্রমাণ হয় যে, রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, তাঁর জীবনের প্রথম পর্বেই এর মূল সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

সমালোচকদের আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ পরিণতির দিকে এগিয়েছে। কিন্তু তাঁর চিত্রকলা যেন শুরু থেকেই বেশ পরিণত, অর্থাৎ তাঁর চিত্রকলায় কোথাও কোনো কাঁচা অসংযত তুলির টান লক্ষ্য করা যায় না। প্রত্যেকটি রেখা, মুখের ভঙ্গির মধ্যে অপ্রয়োজনীতার প্রকাশ ঘটেনি বিন্দুমাত্র। এখানেই তাঁর আঁকার সার্থকতা।

ছবি আঁকা সম্বন্ধে অমিয় চক্রবর্তীকে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন।......"আর আছে আমার ছবি; কোথা থেকে দেখা দিতে এসেছে এই শেষ বেলায়, যখন রোদ্দুর পড়ে এল। আমার এই রেখানাট্যের নটী আর কারো চোখে ধরা দেয় কিনা তার সঠিক খবর পাইনে। ইংল্যাণ্ড থেকে দুই একটা প্রেস নোট বেরিয়েছে, নিন্দে করেনি—দুই-একটা পেট-মোটা রকমের প্রশংসা। প্যারিসে একদা এর চেয়ে বেশি উঁচু গলায় বলেছিল বহুৎ আচ্ছা। কিন্তু এই প্রশংসা টেঁকসই কিনা সে তর্ক বাজারে ওঠে নি, আমার মনেও না। আমার চৈতন্য অন্তঃপুরে রেখা-রূপের জাদুনর্তকীরা একদিন পর্দানশিন ছিল, আজ পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এসেছে। আমার কাছে এই অদ্ভুত প্রকাশ লীলার আনন্দই যথেষ্ট।"

৩

ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক পরিবেশ ঃ

একসময় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবার ছিল বাঙলার সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প এবং সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। ওখান থেকেই তখন এসবের আবর্ত উঠে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল ক্রমে ক্রমে। একথা সকলেরই জানা আছে।

এই ঠাকুরপরিবারের জগৎ আলো-করা রত্ন—রবীন্দ্রনাথ। নামকরণ-কর্তার দূরদৃষ্টিকে সার্থক প্রতিপন্ন করে তিনি বিকশিত হলেন শিল্পকলার নানা শাখায়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ তার অনেক পরে।

কিন্তু দুই আত্মা যেন অভিন্ন। মাঝখানে বারো বছরের (১৯৪৯-৬১) দূরত্ব পেরিয়ে দু'জনে কখন কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে কেউ জানে না।

নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী রবীন্দ্রনাথের যেমন একদিক—

সুহৃদিক্ তেমনি জ্যোতিদাদা। এদের দু'জনের উৎসাহের ঢেউয়ে চড়ে রবীন্দ্রনাথ খ্যাতির আলোয় এসে দাঁড়াতে সমর্থ হয়েছিলেন একথা হয়তো কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে বারে বারে এঁদের ঋণের কথা উল্লেখ করেছেন,—একসময় পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরি করায় মাতিয়াছিলেন।······

"আমি ও অক্ষয়বাবু (কবি অক্ষয় চৌধুরী) তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিসি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল।"

বাল্মীকিপ্রতিভা, কালমৃগয়া ও মায়ার খেলা এই তিনখানি নাটক রচনা ও অভিনয়ের ব্যাপারে জ্যোতিদাদার প্রত্যক্ষ প্রভাব যে রবীন্দ্রনাথের উপর কাজ করেছিল তা রবীন্দ্রনাথের জীবনীতেই জানা যায়।

—"বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম, সে উৎসাহে আর কিছু রচনা করি নাই। জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্তদিন ওস্তাদি গানগুলিকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছ মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন।······

আমি ও অক্ষয়বাবু অনেক সময় জ্যোতিদাদার সেই বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সুরে কথা যোজনার চেষ্টা করিতাম। এইরকম একটা দস্তুর-ভাঙ্গা গীতবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই দুই নাট্য লেখা"।

শুধু সঙ্গীতেই নয়, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রেও জ্যোতিদাদা রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণা যোগান। রবীন্দ্রনাথ একথাও পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে গেছেন—'সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চায় বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি নিজে উৎসাহী এবং অন্যকে উৎসাহ দিতে তাঁহার আনন্দ। আমি অবাধে

তাঁহার সঙ্গে ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম। তিনি বালক বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতেন না।

তিনি আমাকে খুব একটা বড়ো স্বাধীনতা দিয়েছিলেন; তাঁহার সংস্রবে আমার ভিতরকার সংকোচ ঘুচিয়া গিয়াছিল। এইরূপ স্বাধীনতা আমাকে আর কেহ দিতে সাহস করিতে পারিত না; সেজন্য হয়তো কেহ কেহ তাঁহাকে নিন্দাও করিয়াছে।...সে সময় এই বন্ধনমুক্তি না ঘটিলে চিরজীবন একটা পঙ্গুতা থাকিয়া যাইত।'

জীবনস্মৃতি।

'ভারতী' পত্রিকা চালানোর ব্যাপারে জ্যোতিদাদার' উৎসাহ কম ছিল না।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একজন ভালো আঁকিয়ে ছিলেন। তিনি যখন হিন্দু স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়েন তখন থেকেই তাঁর হাতে ছবির আঁচড় ফুটে উঠতে থাকে।

একবার তিনি রায়পুরের প্রতাপনারায়ণের ছবি এমন নিখুঁতভাবে আঁকেন যা দেখে বাড়ীর সকলেই প্রশংসা করতে থাকেন। অথচ এর আগে তিনি কারো মুখের ছবি আঁকেন নি। নেহাতই খেয়াল খুশির বশে তিনি এক-একজনার ছবি এঁকে ফেলতেন। তাতে না পাওয়া যেত পাশ্চাত্য শিল্প নিয়ে দুর্ভাবনা, না থাকত মোঘল চিত্ররীতির সামান্যতম অনুসরণ।

রবীন্দ্রনাথের মুখের বিভিন্ন ভঙ্গিমাও জোতিরিন্দ্রনাথ নিখুঁত করে বহু স্থানে আঁকেন। এমনি ধরণের ১২ খানি ছবি কলকাতায় রবীন্দ্রভারতীতে রাখা আছে।

এই অধ্যায়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির প্রতিভাবান ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রতিভার উপর আলোকসম্পাত করে এটাই দেখাবার চেষ্টা করব যে, রবীন্দ্রনাথ ঐ সব ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রতিভার আলোর সামনে দাঁড়িয়ে কেমন ভাবে ক্রমশঃ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

ঠাকুরবাড়িতে প্রতিভাবান ব্যক্তিদের যেন একত্র সমন্বয় ঘটেছে। তাই এ-বাড়ির ঐতিহ্যের ইতিহাস জানেন না এমন মানুষ বাঙলাদেশে বড় একটা নেই।

শুধু এদেশে নয়, বিদেশের মাটিতেও ঠাকুরপরিবারের নাম সুবিদিত। অবসর কাটাতে বা কাউকে সম্মান জানাতে লাটসাহেব তাঁর সেক্রেটারি এবং অন্যান্যদের নিয়ে প্রায়ই চলে আসতেন ঠাকুরবাড়ি। নিজে একা আসতেন না একে ওকে সঙ্গে নিয়ে আসতেন। হয়তো বিলেত থেকে কোনো পরিচিত কেউ এসেছেন তাঁকে নিয়ে এলেন ঠাকুরবাড়ির আর্টিস্টদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিতে, ছবি দেখাতে।

এ ধরনের আসা-যাওয়া, প্রীতি বিনিময় তাঁদের সঙ্গে প্রায়ই চলত।

শুধু এরাই নয়, এদেশের এবং বিদেশের বহু গুণী-জ্ঞানীদের শুভাগমন ঘটেছিল এই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। বহুজনের মিলনক্ষেত্র ঠাকুরবাড়ি তাই আজ পুণ্যস্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আকাশে মাথা তুলে।

বৃহৎ ঠাকুরবাড়ির আর এক প্রতিভাবান শিল্পী ছিলেন গগনেন্দ্রনাথ। পিতা গুণেন্দ্রনাথের তিনি প্রথম পুত্র। তিন পুত্র গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ এদের রেখে তিনি পৃথিবীর খেলাঘর ছেড়ে চলে যান অপরিণত বয়সেই।

বাবার অকালমৃত্যুর পর বহু গুণবতী মায়ের সঙ্গে একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারে সকলের প্রিয়জন হয়ে বড় হতে থাকেন সকলে।

ইঁটকাঠের জঙ্গলে ঘেরা কলকাতা আর তার ভিখিরী, ফেরিওয়ালা, নিঃসঙ্গ গাছের মাথায় পাখী, অলস ও ব্যস্তভাবে চলা পথিক এসব গগনেন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করল।

তিনি চেয়ে চেয়ে দেখতেন। দেখার মধ্য দিয়ে সবকিছুতে রূপ

খুঁজে বেড়াতেন। আর সেসব, চোখের আলো থেকে তুলির আঁচড়ে ধরা দিতে লাগল।

শুধুমাত্র শহর কলকাতায় তার শিল্পীমন, তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ হয়ে ছিল না। কলকাতাকে ছাড়িয়ে বাঙলার গ্রাম, মাঠ, আকাশ, নদীর ঘাট, কলসিকাঁখে কুলবধূটিও শিল্পীর নজরকে এড়াতে পারেনি। এরা অনেকবার গগনেন্দ্রনাথের তুলির মাধ্যমে চিরকালের জন্য ধরা পড়েছে।

বাড়ির নক্‌শা আঁকতে তিনি ভালোবাসতেন। এ আগ্রহ, এ রুচি সম্ভবত তিনি বাবা গুণেন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এছাড়া ব্যঙ্গচিত্র তাঁর তুলিতেই প্রথম প্রকাশ পায়। গগনেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গচিত্র যাঁরা দেখেছেন তাঁরা গগনেন্দ্রনাথের মেধা ও অঙ্কন-নৈপুণ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। কারণ, এখানে কোথাও ইতর আঘাতের রেশমাত্র নেই। তাঁর ব্যঙ্গচিত্রের নমুনা রবীন্দ্রভারতীতে আছে।

শিল্পী হিসেবে গগনেন্দ্রনাথের নাম সকলের কাছে পরিচিত। কিন্তু অঙ্কন ছাড়াও তাঁর আরো অনেক দক্ষতা ছিল।

অভিনয়ে দক্ষতা গগনের সহজাত ছিল। মনে হয় জন্ম থেকেই এই গুণ তিনি পেয়েছিলেন। এর পেছনে অবশ্য একটা কারণ আছে। এ পরিবারে নাট্যশিল্পের প্রতি স্বভাবজাত প্রীতি ঠাকুরদার সময় থেকে চলে আসছে। ঠাকুরদা গিরীন্দ্রনাথ অভিনয় তো করতেনই, নাটক রচনাতেও ভালো হাত ছিল। নাটক লিখতেন, যত্ন নিয়ে ছবিও আঁকতেন। বহু খ্যাতিমান বিদেশী শিল্পীদের তৈলচিত্র গিরীন্দ্রনাথ নকল করতেন।

মৌলিক ছবিতে নাম না পেলেও নিখুঁত চিত্রের প্রতিলিপির জন্য গিরীন্দ্রনাথ সুনাম কুড়িয়েছেন যথেষ্ট।

তিনি গানও রচনা করতেন। শুধু রচনাই নয়, তাতে সুর দিতেন। যেমন, তিনি অভিনয় করার সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় শিক্ষাও দিতেন।

গগনেন্দ্রনাথের পরের ভাই সমরেন্দ্রনাথ।

গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ এই দুই ভাই জগৎ জোড়া নামের আড়ালে থাকলেও সমরেন্দ্রনাথও যে মনে-প্রাণে একজন সত্যিকারের গুণী শিল্পী ছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর আগে। সেই সময় তিনি যে কয়েকটি ছবি তাঁর তুলি দিয়ে এঁকেছেন সে সবের মূল্য শিল্পের ক্ষেত্রে অনেক।

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে নতুনভাবে চেনাবার কোনো প্রয়োজন দেখি না। তিনি ছিলেন 'শিল্পীগুরু'। গগনেন্দ্রনাথের ছোট ভাই এই অবনীন্দ্রনাথের নাম শিল্পক্ষেত্রে চিরপরিচিত। তাঁর ছবি এদেশেই শুধু নয়, বিদেশেও সমান কদর ও সম্মান পেয়েছে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম নন্দলাল বসু ও অসিত হালদার। এঁরা অবনীন্দ্রনাথের অনুরোধে ও সিস্টার নিবেদিতার ইচ্ছানুসারে অজন্তা গুহার সমস্ত ছবি হুবহু নকল করে আনেন।

পরে এইসব ছবি গগনেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে অবিকল অজন্তা গুহার মত সাজিয়ে নিবেদিতা ও বহু গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করে দেখানো হয়। নকল গুহার মধ্যে বড় বড় ছবির সামনে দাঁড়িয়ে অতিথিরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। সমগ্র গুহাটাই নন্দলাল ও অসিত হালদার যেন তুলে এনেছিলেন।

তিন ভাইয়ের ছোট বোন সুনয়নী দেবী।

স্বামী-পুত্র, নাতি-নাতনীদের নিয়ে যে প্রকাণ্ড সংসার, তার মধ্যমণি হয়ে থাকলেও তিনি সেই সময়ই পাস্টেল আর তুলি ধরতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ করেন নি। অন্তরের এই অনুপ্রেরণা তাঁকে এ ব্যাপারে সমানে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাই দেখা যায় তাঁর হাত দিয়ে ফুটে উঠেছে এক-একটি অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় ছবি।

অনেকের মতে সুনয়নী দেবীর ছবিতে কালীঘাটের পটুয়াদের অঙ্কনরীতির ছাপ দেখা যায়। তাঁর আঁকা রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি রবীন্দ্রভারতীতে রয়েছে।

নারী বলেই যে তাঁর ছবি আঁকা শুধু সময় কাটানো ও মনের সাময়িক উৎসাহের নিবৃত্তি করা, তা নয়। সমস্ত দ্বিধা ও জিজ্ঞাসাকে পেছনে ফেলে বহুবার প্রদর্শনীর মাধ্যমে তিনি তাঁর ছবিগুলিকে লোকচক্ষুর গোচরে আনেন।

গগন, অবনদের বাবা গুণেন্দ্রনাথ ছবি আঁকা শেখেন বহুবাজার আর্ট স্কুলে। তিনি ও তাঁর জ্যাঠতুতো ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই বহুবাজার স্কুলে প্রথম ছাত্র হিসেবে ভর্তি হন। এঁদেরই সক্রিয় প্রচেষ্টায় ইণ্ডাস্ট্রীয়াল আর্ট সোসাইটির সূচনা হয়। শিল্পসাধনায় গুণেন্দ্রনাথের উত্তম ছিল। তিনি যদি দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতেন তবে শিল্পী হিসেবে নাম করতে পারতেন এবং সেই সঙ্গে পুত্র-কন্যাদের সাধনার পথ প্রশস্ত করে যেতে পারতেন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুযোগ্য ছাত্র অসিত হালদার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারে ১৮৯০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে আত্মীয়।

খুব অল্প বয়স থেকেই তাঁব মনে শিল্প সম্বন্ধে ঔৎসুক্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর বাবা তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতেন। ১৫ বছব বয়সে অসিত হালদার কলকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। তখন সেখানে একই সময় নন্দলাল বসু ও সুরেন গাঙ্গুলী ছাত্র হিসেবে ছিলেন। অসিত হালদার আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ অবনীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর শিক্ষকতায় ও ব্যক্তিত্বে অভিভূত হন।

শিক্ষান্তে রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে অসিত হালদার শান্তিনিকেতনে কলাভবন প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানকার অধ্যক্ষেব পদ গ্রহণ করেন। বারো বছর একাদিক্রমে তিনি এই পদে ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকে 'সেট' তৈরী করেন, আল্পনা আঁকেন।

রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও সাহচর্য অসিত হালদারকে নূতন পথে এগিয়ে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মধ্যে প্রতিভার আলো লক্ষ্য করেছিলেন এবং এই প্রতিভা বিশ্বের অনেক দেশে ছড়িয়ে ছিল।

এত শিল্পী, সাহিত্যিকদের একত্র সমাবেশে ঠাকুরবাড়ির নাম কোথাও অজানা থাকে নি।

৪

ঘরের মানুষ রবীন্দ্রনাথ

সীতা দেবীর 'পুণ্যস্মৃতি' ও নির্মলকুমারী মহলানবীশের 'বাইশে শ্রাবণ' বইতে দেখা যায় প্রাত্যহিক জীবনে রবীন্দ্রনাথ কত সহজ সরলভাবে সকলের সঙ্গে মিশেছেন। সবাইকে আপন করে দেখেছেন, প্রাণখোলা আনন্দে সকলকে ভরিয়ে দিয়েছেন। এর সঙ্গে তাঁর বয়স, খ্যাতি, সম্মান, প্রতিষ্ঠার কোনো সম্পর্ক ছিল না। তিনি নিজেই এসব সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখতেন।

লেখার সময়ও কারো উপস্থিতিতে তিনি বিরক্ত হতেন না। এক পাগলের বক্তব্য শোনার জন্যও তিনি তাঁর কত অমূল্য সময় নষ্ট করেছেন, তার কষ্টে নিজে কত কষ্ট অনুভব করেছেন সেসব কথা লিপিবদ্ধ আছে 'বাইশে শ্রাবণ' বইতে।

ছবি আঁকার সময় তিনি কেমন করে আঁকতেন, কথা বলতে বলতে তাঁর তুলি কত বিচিত্র ভাবে কাগজের উপর খেলা করত, এসব বিবরণও লিপিবদ্ধ আছে রাণী চন্দর লেখা 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' বইয়ে।

'সেসব দিনগুলিকে অতি যত্নে, অতি আন্তরিকতার সঙ্গে রাণী চন্দ তাঁর বইয়ে ধরে রেখেছেন। এখানে আলাপ আলোচনার মধ্যে শিল্পী রবীন্দ্রনাথের নতুন রূপ প্রকাশ পেয়েছে।

"মাঝে মাঝে ছবি আঁকা তাঁকে নেশার মত পেয়ে বসত। রঙের পর রঙ লাগাতেন। আর এত তাড়াহুড়োতে ছবি আঁকতেন—খেয়াল থাকত না কী রঙ লাগাতেন—রঙ বেছে নেবার অবসর নেই—হাতের কাছে যে শিশি পাচ্ছেন তাতেই তুলি ডুবিয়ে নিচ্ছেন। অনেক সময় দেখা যেত—উল্টো রঙ লাগাবার জন্য আগাগোড়া ছবিই বদলে ফেলতেন।"

অনেকের মত খুব কাছে থেকে দেখা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর আঁকা ছবি নিয়ে এমনি অনেক ছোট বড় ঘটনার সমাবেশ রাণী চন্দ তাঁর বইয়ে একের পর এক সাজিয়ে রেখেছেন।

১৯৩৮ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারীতে শ্রীমতী চন্দর লেখা ডায়েরীর পাতা থেকে কিছু অংশ এই প্রসঙ্গে তুলে ধরছি—

"আজ সকাল থেকেই গুরুদেব ছবিই আঁকছেন। এরই মধ্যে দুখানা আঁকা হয়ে গেল। আর একখানা শুরু করলেন। ছবি আঁকতে আঁকতে বললেন—'আমার ছবি আঁকতে এত ভালো লাগে অথচ আমায় এরা ছবি আঁকতে সময় দেবে না—কেবলই ফরমাশ করবে, এটা করো, ওটা করো।"

ডায়েরীর এই একটি পাতাতেই শিল্পী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপী রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে।

ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে গল্প করতে অভ্যস্ত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কাছে কেউ থাকলে ভালো, আবার না থাকলে অসুবিধের কোনো কারণ ঘটত না। নিজের আঁকা ছবির সঙ্গেই আলাপ জমাতেন অবাধে। বলতেন—'কি গো, মুখ ভার করে আছ কেন—আর একটু রঙ চাই তোমার? কালো রঙটা তোমার পছন্দ হোলো না বুঝি?

আচ্ছা এই নাও। দেখো তো কত করে তোমার মন পাবার চেষ্টা করছি, তবু তোমার চোখ ছল ছল করছে। তা থাকো ছলছল চোখেই, আমি আবার একটু জলভরা নয়নই ভালোবাসি কিনা দেখতে।'

ছবি আঁকতে বসে আঁকাটাকেই রবীন্দ্রনাথ বড় করে দেখেন নি। তাঁর আঁকার মধ্যে দিয়ে ভালোলাগা মন্দলাগা, নিজের আনন্দ সব কিছুকেই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাই বলে ছবির গৌরব কোথাও বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি।

রাণী চন্দর মতো মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বইতে এক ঘরোয়া পরিবেশে শিল্পী রবীন্দ্রনাথের একটা দিক তুলে ধরেছেন।

১৯৩৮ সালের ২১শে মে রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার কালিম্পং থেকে মংপু আসেন। ৯ই জুন পর্যন্ত এখানে কাটিয়ে আবার কালিম্পং ফিরে যান।

দ্বিতীয়বার ১৯৩৯ সালের ১৪ই মে পুরী থেকে মংপু এসে গ্রীষ্মাবকাশ কাটিয়ে ১৭ই জুন কলকাতায় ফেরেন। ঐ বছর শরৎকালে আবার মংপুতে আসেন রবীন্দ্রনাথ এবং দু'মাসের কিছু বেশীদিন থেকে নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতায় চলে যান।

১৯৪০ সালের ২১শে এপ্রিল চতুর্থবার কবিগুরু আবার এখানে আসেন। ২৫শে বৈশাখের উৎসবে এখানেই তিনি থাকেন, তারপর কালিম্পং যান।

এই আসা যাওয়ার মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ যে দিনগুলি মংপুতে কাটিয়ে যান সেসব দিনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনাগুলিও মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর অসাধারণ লেখনী-শক্তির সাহায্যে 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বইয়ে অক্ষয় করে রেখেছেন।

একদিনের ঘটনা।

"আপনার জন্য একটা সামান্য উপহার আছে, তবে একেবারে নিঃস্বার্থ নয়।" মাসি এক বাক্স রং-তুলি-কাগজ নিয়ে হাজির।

'ও কি ও, oil colour ? এ আমি কখনো আঁকিনি'।

'এইবার আঁকুন, ছবিটা কিন্তু আমার চাই।'

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রত্যেকটি রং দেখতে লাগলেন। 'ও বাবা, এসব কি আমার কাজ ? আমার হোলো অশিক্ষিত পটুত্ব।'

'অনেক করে বুঝিয়ে বলে, কাগজ কেটে, বোর্ড দিয়ে রং সাজিয়ে দেওয়া হ'ল, ফস্ করে একটা মুখের outline টেনে তারপর ভাবতে লাগলেন। যেন বিষম বিপদে পড়ে গেছেন।

'মাসী ! একি সঙ্কটে ফেললে।'

সকলে মিলে খাবার ঘরে গল্পসল্প করছে, এমন সময় হঠাৎ আলুবাবু কোথা থেকে ছুটে এলেন—'শীগ্‌গির চলে আসুন, ছবি নিয়ে হৈ চৈ করছেন'।

ঘরে ঢুকে দেখা গেল জামায় রং মেখে ছবিখানা নিয়ে বসে আছেন। ঐ মুখের outline-এর উপর কিছু রং জড়ো হয়েছে। সকলকে দেখে বলে উঠলেন—

—'এসো মাসী, আমার 'মুখ' রক্ষা করো—একি আমার দ্বারা হয় ?'

এমনি ভাবে ঐ ছবি নিয়ে চলল কয়েকদিন। মাসী একটু করে রং লাগিয়ে দেন আর ওর কাছে যান। তাই দেখে রবীন্দ্রনাথ আবার একটু করে বলে দেন। কোন্ জায়গায় কতটা রং দিতে হবে, কি রং দিতে হবে।

এই করে ছবিটি যখন শেষ হল তখন মাসী রং তুলি নিয়ে হাজির রবীন্দ্রনাথের কাছে।

—'আপনার নাম লিখুন'।

—সেকি, আমার নাম লিখব কেন ? তার চেয়ে তোমার নাম লিখে দিই বরং'।

—'বাঃ তা কেন, আপনিই তো আঁকলেন মুখখানা'।

—'তা হোক, মুখ রক্ষা তো তুমিই করলে। কাজেই সে অধিকার না হয় ছেড়েই দিলুম তোমায়।'

—'না, না, আপনার নাম লিখুন—তার নিচে আমি লিখব।'

রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ জলের রং, রং-এর কালি, রং-এর পেনসিল কলম, এইসব ব্যবহার করতেন—তেলের ছবি ওঁর আঁকা আর আছে কিনা সন্দেহ।

আর একদিনের কথা—

'আচ্ছা কি কি রং গুলব?'

'আহা, আগে কাগজটা নাম্বা করে কাটো। তবে তো? বনমালীর কাছ থেকে আমার ভাষার খুব উন্নতি হচ্ছে, আজকাল আর লম্বা বলতে ইচ্ছেই করে না।'

এরপর কিছুটা হতবাক্ হয়ে গিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে ঠাট্টার সুরে বললেন—'আচ্ছা' তুমি তো কৃপণ বড় কম নও; এই রকম জলবৎ তরলং রং দিয়ে কি চান করব?'

—'আহা তা কেন, water colour-এর রং তো এমনই গোলা হয়।'

—'ও, উনি এখন আমাকে water colour-এর আইন শেখাবেন। দেখ কন্যে, এ বয়সে আর শিক্ষার কোন আশাই নেই, অতএব আমাকে যদি একটু মোটা রং গুলে দাও তাতে তোমার যা খরচ হবে, এখনও আমার কলমের বাক্সে যে সাড়ে আট-আনা পয়সা আছে তা থেকে দিয়ে দেব নিশ্চয়। আমার কী অত ধৈর্য আছে যে একটা রং দিয়ে একঘণ্টা অপেক্ষা করে থাকব কতক্ষণে শুকোবে?'

—'আহা-হা, করেন কি, সব রং যে ক্যাল্লাড়ময় হয়ে গেল—'

—'তুমি একটু দাও তো সুমধ্যমে—কথাটা কতটা correct হোলো জানিনে, তবু বলে তো ফেলা গেল, লাগে তো লেগে যাক্।

'এমনি কথার মধ্য দিয়ে আঁকা হোলো একটা সুন্দর বনের ছবি। ঘণ্টাখানেক ধরে রবীন্দ্রনাথ আঁকলেন ছবিটা।

—'এই লও, তোমাদের সুরেলের বন। তুমি যে ভাবো আমি একেবারে আঁকতে পারি নে, আমার ছবি লোকে দয়া করে ভালো বলে, তোমাব সে ধারণাটা ভাঙ্গতে হবে। কী চুপ করে যে? বললে না, কী আশ্চর্য কখন তা বললুম বা ঐ জাতীয় একটা কিছু? অন্ততঃ ভদ্রতা করেও তো বলতে হয়।"

একদিন বিকেলে পড়ন্ত রোদের দিকে মুখ করে বসে আছেন। থালার মত গোল সূর্য একটু একটু নেমে যাচ্ছে পশ্চিমের গাছের আড়ালে। তার লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে সাদা মেঘের গায়ে আর বড় গাছের মাথায়।

সামনে রাখা কাগজ-কলম নিয়ে কখনো কবিতা লিখছেন আবার তা স্থানে স্থানে কাটছেন। এরই মধ্যে তিনি মৈত্রেয়ী দেবীকে কাছে পেয়ে তার জীবনের এক ক্ষোভের কথা প্রকাশ কবলেন।"—তোমাদের জন্যই তো লিখেছি, তোমরা যারা পড়ে আনন্দ পাও। কিন্তু কবি বা শিল্পীব অদৃষ্টলিপি আরো জটিল, অর্থাৎ যারা কিছুমাত্র আনন্দ পায় না, বোঝে না, তাদেব কাছেও জবাবদিহি করতে হয়। অন্য সব বিষয়েই —দর্শনে বল, অঙ্কশাস্ত্রে বল, ব্যাকরণে, বিজ্ঞানে সব কিছুতেই অনধিকারী কোনো কথা বলতে পাবে না। যেটা যার বিষয় সেই-ই সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু সাহিত্য যেন পথে পড়ে আছে, যেন ওর মর্ম গ্রহণ করবার জন্য কোন শিক্ষার অপেক্ষা নেই। যে খুশি সে তার বিচাবক হয়ে বসতে পারে।"

"তেমনি দেখি ছবির বেলাতেও। যারা ছবি দেখতে জানে না, ছবি দেখার মন নয় যাদের, তারাও অনায়াসে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করবার স্পর্ধা রাখে। অন্য সব ক্ষেত্রেই প্রথমে মাথা নিচু করে শিক্ষার্থীকে প্রবেশ করতে হয়, কিন্তু আমাদের কপালে সকলেরই

উদ্ধত শির, সকলেই মস্ত বিচারক এবং তাদের মতামতও মূল্য পায়। আমি সারাজীবন ধরে এই কাজ করছি। কিন্তু অনায়াসেই যে-কোনো একজন লোক বলতে পারে এবং বলবার স্পর্ধা রাখে—রবিবাবু কিন্তু এটা ঠিক ফোটাতে পারেন নি। কিংবা রবিবাবুর লেখায় ইত্যাদি ইত্যাদি …।"

এই মন্তব্যের মধ্যে কোথায় গেল সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ, কোথায় গেল সেই কথায় কথায় বয়সের ভার কাটানো হাস্য-পরিহাস। বাস্তব জীবনের করুণ অভিজ্ঞতা এখানে তিনি ব্যক্ত করিলেন দুঃখের সঙ্গে। বহুবার এর মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি আর অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন এর দংশন, তারই প্রকাশ ঘটালেন রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে।

৫

আত্মসমালোচক রবীন্দ্রনাথ ঃ

'শেষের কবিতা'র প্রায় শুরুতেই অমিত রায় সভাপতির ভাষণে বলছে—"...রবিঠাকুরের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো নালিশ এই যে, বুড়ো ওঅর্ড্‌সওঅর্থের নকল করে ভদ্রলোক অতি অন্যায়-রকম বেঁচে আছে। যম বাতি নিবিয়ে দেবার জন্য থেকে থেকে ফরাশ পাঠায়, তবু লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও চৌকির হাতা আঁকড়িয়ে থাকে। ও যদি মানে মানে নিজেই সরে না পড়ে, আমাদের কর্তব্য ওর সভা ছেড়ে দল বেঁধে উঠে আসা।...রবিঠাকুরের দলের এই অবৈধ ষড়যন্ত্র আমি পাব্লিকের কাছে প্রকাশ করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি।"

...রবিঠাকুর সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, তাঁর রচনারেখা তাঁরই হাতের অক্ষরের মতো—গোল বা তরঙ্গরেখা, গোলাপ বা নারীর মুখ বা চাঁদের ধরণে। ওটা প্রিমিটিভ; প্রকৃতির হাতের অক্ষরের মক্‌শো করা।"

রবীন্দ্রনাথ এমনি করে তাঁর 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে বারে বারে

নিজেকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। সমালোচনা করেছেন, যুক্তি-তর্কের জালে নিজেই নিজেকে বদ্ধ করেছেন।

শুধু এই উপন্যাসেই নয়, নিজের বহু রচনাকে, কাজকে কতবার কত রকমভাবে যে তিনি পর্যালোচনা করেছেন তার হিসেব নেই।

ছবির ব্যাপারেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

তিনি প্রায়ই নিজের ছবির সমালোচনা করে বলতেন— 'আমি কি আর ছবি আঁকি—শুধু আঁচড় কাটি। নন্দলাল তো আমাকে শেখালে না, কত বললুম।' বলে সামান্য ম্লান হেসে চুপ করে থাকতেন।

তাঁর যে ছবি বিদেশে সম্মান পাবার যোগ্য, সেই ছবিব উপরই তাঁর যেন তেমন আস্থা বা ভরসা ছিল না।

তিনি বলতেন,—'আমার ছবির বিষয়ে আমার বলবার কিছুই নেই। আমি কী করেছি, কি বলতে চেয়েছি, তা আমিই জানি না। নন্দলাল আমার ছবি সম্বন্ধে বলেছে, আমরা এ থেকে শিক্ষা পাব।' অথচ আমি বুঝিনে কিছু। ফ্রান্সেও বলেছিল যে অনেকদিন ধরে আমরা যেটা চেষ্টা করেছি, তুমি সেটা পেরেছ। আমি বললুম— সেটা কী। তারা বললে—তা তোমাকে বোঝাতে পারব না'।

'জানিস্, আমি আর্টিষ্ট নই। আমি যা আঁকি, তা মনের অগোচরে। ইচ্ছা করে আঁকতে, তার একটা রূপ দিতে—তা আমার দ্বারা হয় না। হিজিবিজি কাটতে কাটতে একটা কিছু রূপ নিয়ে যায়। একে কি আর্টিষ্ট বলে। তোমরা আমায় স্তুতি-বাক্যে ভোলাও। দেখো না কতগুলি মাথামুণ্ডুই আঁকলাম। কোনটার গোঁফ আছে, কোনটার নেই, কোনটা বেঁকে আছে, কোনটা অদ্ভুত —এর কি কোন মানে আছে?

'আমার ছবিতে হাসিখুশি ভাব থাকে না কেন বলতে পারিস্? অথচ আমি নিজে হাসতে ও হাসাতে ভালোবাসি, কিন্তু আমার

সব ছবিরই ভাব কেমন যেন বিষাদমাখা। হয়তো ভিতরে আছে আমার ওটা।"

রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়স থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত আপনজনের মৃত্যুশোক পেয়েছেন বহুবার। সেই সমস্ত শোককে তিনি মুখের হাসি দিয়ে ঢেকে রাখতে চাইলেও কলমের আঁচড়ে ও তুলির আঁচড়ে তা প্রকাশ পেয়েছে অনেকবার। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ সন্তান শমীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কত প্রতিভাদীপ্ত পুরুষ এ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু সবচেয়ে পরিতাপের কথা রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই ঠাকুরপরিবারের এত পরিজন নিয়ে রচিত বিরাট পুষ্প-স্তবকের প্রায় সমস্ত পাপড়িই ঝরে গেল একে একে তাঁর চোখের সামনে। একা রবীন্দ্রনাথ এত শোকের স্মৃতি বহন করে শূন্য প্রান্তরের মাঝে বিশাল মহীরুহের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

—"দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে"......

ছবিতে এরই প্রকাশ ঘটেছে। লেখার ফাঁকে ফাঁকে এক একটা মুখ এসে মনের মধ্যে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। আর তারাই লেখার সময় কেড়ে নিয়ে নিজেদের আঁকাতে বাধ্য করিয়েছে।

সাধারণতঃ প্লানচেটের মাধ্যমে মানুষ তার নিজের কৌতুক ও কৌতূহল মেটাতেই উৎসাহিত হয়। অজানাকে জানার আগ্রহ তখন মনকে পেয়ে বসে। শরীর মনকে রোমাঞ্চিত করে।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে হোলো অন্যরূপ। তিনি প্লানচেট করে এতেই সন্তুষ্ট থাকতেন না। নিজেকে প্লানচেটে ডেকে আনা আত্মার কাছে সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরতেন। জানতে চাইতেন নিজের গুণাগুণ, শুভ-অশুভ নির্দ্বিধায় মতামত চাইতেন।

রবীন্দ্রনাথ প্লানচেটে ডেকে এনে অন্তরঙ্গদের কাছে নিজের ছবি সম্বন্ধে তাদের মন্তব্য জিজ্ঞাসা করতেন।

অমিতাভ চৌধুরীর 'রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা' বইতে এর উল্লেখ দেখা যায়। এখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ডেকে আনা আত্মার কথোপকথন বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এক একজন আত্মা তাঁর সামনে আসেন আর উত্তর দিয়ে চলে যান।

রবীন্দ্রনাথের এক প্রশ্নের উত্তরে সুসাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের[১] আত্মা লেখেন—'আপনার ছবি য়ুরোপে আদর পাবে তাতে সন্দেহ নেই।'

জ্যোতিদাদা বললেন—'আশঙ্কা কোরো না, তোমার ছবি জগতে একটা নতুন আলো দেখাবে।'

আর এক জায়গায় দেখি, শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায়কে প্লানচেটে ডেকে কবি তাঁর ছবির কথা জিজ্ঞেস করছেন।

—আমি যে ছবি আঁকি, সে কি ভালো?

আত্মা—হ্যাঁ, তাতে সন্দেহ নেই, অপূর্ব।

কবি—ইয়োরোপে তার সমাদর হবে?

উত্তর—হবে।

রবীন্দ্রনাথ যে সময় ছবির পর ছবি আঁকছেন, তখনই তাঁর মনের মধ্যে দ্বিধা, সংকোচ, সংশয় একসঙ্গে উঁকি দিচ্ছিল—ইয়োরোপে তার আঁকা ছবির প্রদর্শনী করা উচিত কিনা। আর সেই ব্যাপারেই তিনি মৃত আত্মীয়দের কাছ থেকে সমর্থন চাইছিলেন।

সমর্থন নেবার সঙ্গে সঙ্গে ছবির গুণাগুণও যাচাই করে নিয়েছেন।

মস্কোতে এক বিরাট মিউজিয়ামে তাঁর ছবির প্রদর্শনী শেষ হবার পর আর এক জায়গায় ঐ ছবির প্রদর্শনী সুরু হয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত সমালোচকদের উদ্দেশ্যে খোলা মনেই বলেন—"তোমরা যখন আমার ছবি দেখবে তখন আমার কবি পরিচয়টা ভুলে

---

১. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা।

যেও। একজন কবি এই ছবি এঁকেছেন ভেবে একটুও মাপ কোরো না, ছেড়ে কথা বোলো না। এরাও তো এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি—কাজেই আমি চাই এরা এদের আপন যোগ্যতায় যেন নিজের স্থান পায়।'

রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত সরল স্বীকারোক্তি, সহজ আত্মবিশ্লেষণ যে একজন বিশ্বখ্যাত কবির মুখ থেকে সহজেই বেবোতে পাবে তা আজকের দিনে যেন বিশ্বাসই করা যায় না, যখন ঠিক এব পাশেই দেখি স্বল্পখ্যাত কোনো ব্যক্তির দাম্ভিকতা।

নিজেকে অকপটে অন্যের কাছে এমনি সামান্য একজন বলে তুলে ধরার জন্য আমেরিকার প্রত্যেক কাগজ কবির সম্বন্ধে বার বার বলেছে—নিজের প্রতিভা ও শক্তি সম্বন্ধে তাঁর এই উদাসীন অজ্ঞতা বড় মধুব।

জীবনের শেষ পর্বে নিজের ছবি আঁকা সম্পর্কে আশঙ্কা ও উদ্বেগ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত একখানি পত্রে প্রকাশ কবেন। এই চিঠিখানির কিছু অংশ নীচে উল্লেখ করছি—

'ক্রমে ক্রমে ছবিগুলোব চেহাবা বদলে আসছে। তোমবা কাছে থাকলে ভরসা পেতুম, কোন্ বাস্তায় চলছি সেটা তোমাদেব সঙ্গে বোঝাপড়া কবে নিতে পাবতুম।...আমার দেশবাসী যাবা, তাবা অত্যন্ত দস্তুব মেনে চলে—আমার সমস্তই বেদস্তুব—তারা হয় মুরুব্বিভাবে বলবে, চেষ্টা কবলে কিছু হতেও পারে, নয় বলবে, যাচ্ছেতাই—দুটোই ভালো নয়।"

(কার্তিক ১৩৩৫। বিশ্বভাবতী পত্রিকা)।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লেখা এক চিঠিতে চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের মানসিক দ্বন্দ্বর কথা জানা যায়।

—'ঐ যে চিত্রবিদ্যা ব'লে একটা বিদ্যা আছে তাব প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি—কিন্তু আর আশা নেই, সাধনা করবার বয়স চলে গেছে।...তুলি টেনে টেনে একেবারে হয়রাণ না হলে তার প্রসন্নতা লাভ করা যায় না।' (ছিন্নপত্র, পত্র ৯২)

এরপর আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা চিঠিতেও দেখা যায় এই একই ভাব প্রকাশ পেয়েছে—

'শুনে আশ্চর্য হবেন, একখানা sketch book নিয়ে ব'সে ব'সে ছবি আঁকছি। বলা বাহুল্য, সে ছবি আমি প্যারিস সেলোন-এর জন্য তৈরী করছিনে এবং কোন দেশের ন্যাশন্যাল গ্যালারী যে এগুলি স্বদেশের ট্যাক্স বাড়িয়ে সহসা কিনে নেবেন এরকম আশঙ্কাও আমার মনে লেশমাত্র নেই।

(১৭ সেপ্টেম্বর ১৯০০)

আর একখানা চিঠিতে সুহৃদ জগদীশ বসুকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অর্থহীন তুলি চালনার কথা প্রকাশ করে লেখেন—"...কুৎসিত ছেলের প্রতি মার যেমন অপূর্ব স্নেহ জন্মে, তেমনি যে বিদ্যাটা ভাল আসে না সেইটের উপর অন্তরের একটা টান থাকে। সেই কারণে যখন প্রতিজ্ঞা করলুম, এবারে ষোল আনা কুঁড়েমিতে মন দেবো তখন ভেবে ভেবে এই ছবি আকাটা আবিষ্কার করা গেছে। এই সম্বন্ধে উন্নতি লাভ করবার একটা মস্ত বাধা হয়েছে এই যে, যত পেন্সিল চালাচ্ছি তার চেয়ে ঢের বেশী রবার চালাতে হচ্ছে, সুতরাং ঐ রবার চালনাটাই অধিক অভ্যেস হয়ে যাচ্ছে—অতএব মৃত র‍্যাফেল্ তাঁর কবরের মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে ম'রে থাকতে পারেন—আমার দ্বারা তাঁর যশের কোন লাঘব হবে না।"...

নিজের ছবি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে যে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংশয়, আশঙ্কা ইত্যাদি একের পর এক জমে উঠেছিল সেসব শুধুমাত্র তাঁর কথাবার্তা বা চিঠিপত্রের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায়নি, প্রকাশ পেয়েছে আরও অন্যভাবে। তাঁর লেখা গল্প 'রবিবার' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সেখানে অভীক চরিত্রে তিনি নিজেই ধরা দিয়েছেন। এ আলোচনায় পরে আসছি।

সাহিত্যে শিল্পীমনের প্রকাশ ঃ

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পর্যায়ের কয়েকটি লেখার মধ্যেও শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে আমরা খুঁজে পাই। মন্মথনাথ সান্যাল মহাশয়ের সম্পাদনাকালে আনন্দবাজার শারদীয়া সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল রবীন্দ্রনাথের গল্প প্রকাশ। এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প 'রবিবার' ১৯৩৯ সালের পূজা সংখ্যাতে প্রকাশ লাভ ঘটে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্ররচনাবলীতে 'রবিবার' গল্পটি স্থান পায় 'তিন সঙ্গী'র একটি হিসেবে। অপর দুটি হোলো শেষ কথা ও ল্যাবরেটরি।

'রবিবার' গল্পের নায়ক অভীক একজন চিত্রশিল্পী। বয়সে তরুণ, কিন্তু এর মধ্যেই তার ছবির ভক্তের সংখ্যা অনেক। হয়তো অনেকে ছবি তেমনভাবে বোঝে না, কিন্তু এদিক ওদিক থেকে সম্মানের মালা তার গলায় আসে অনেক।

এ সত্ত্বেও গল্পের নায়িকা অভীকের প্রিয়তমা 'বী' অর্থাৎ বিভা তার ছবিকে তেমন চোখে দেখে না। —"এই ছবির ব্যাপারে দু'জনের মধ্যে

ছাপ্পান্ন

তীব্র একটা দ্বন্দ্ব ছিল। বিভা অভীকের ছবি বুঝতেই পারত না সে' কথা সত্যি। অন্য মেয়েরা যখন ওর আঁকা যা-কিছু নিয়ে হৈ-হৈ করত, সভা করে গলায় মালা পরাত, সেটাকে বিভা অশিক্ষিতের ন্যাকামি মনে করে লজ্জা পেত। কিন্তু তীব্র ক্ষোভে ছট্‌ফট্ করেছে অভীকের মন বিভার অভ্যর্থনা না পেয়ে। কেবলই এই কল্পনা ওর মনে জাগে যে, একদিন ও য়ুরোপে যাবে আর সেখানে যখন জয়ধ্বনি উঠবে, তখন বিভাও বসবে জয়মালা গাঁথতে।"

আত্মজীবনীমূলক এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ নিজেই যেন ধবা দিয়েছেন অভীক চরিত্রের মধ্য দিয়ে। তাই পাঠকেব বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, অভীক আর কেউ নয়, রবীন্দ্রনাথেবই এক অবিচ্ছেদ্য সত্তা।

গল্পেব শেষে অভীক এ দেশ ছেড়ে জাহাজে করে পাড়ি দিয়ে চলেছে বিলেতে, কিছু অর্থ আব কিছু সম্মানের আশায়। জাহাজে বসে লেখা এক চিঠিতে সে বিভাকে এবাবেব মত শেষ জানিয়ে যেতে চায়,—অনেক মূঢ তাব ছবিব অন্যায় প্রশংসা করেছে। অনেকে মিথ্যাব ছলনা কবেছে, কিন্তু বিভা কোনদিন এ ব্যাপারে তার স্তব করেনি। শুধু সেইদিনের আশায় অভীক দিন গুণছে যেদিন বিশ্বেব কাছে তার ছবি সম্মান পাবে আব বিভা তার হৃদয়ের সুধা মিশিয়ে অভীকেব জন্য অপেক্ষা কববে।

চিঠির মাঝখানে অভীক লিখছে—'তোমাব ওই হারের বদলে আমার একতাড়া ছবি তোমাব গয়নার বাক্সেব কাছে রেখে এসেছি। মনে মনে হেসো না। বাংলাদেশেব কোথাও এই ছবিগুলো ছেঁড়া কাগজের বেশি দর পাবে না। অপেক্ষা কোরো বী, আমার মধুকরী, তুমি ঠকবে না, কখনোই না। হঠাৎ যেমন কোদালের মুখে গুপ্তধন বেরিয়ে পড়ে, আমি জাঁক করে বলছি, তেমনি আমার ছবিগুলোর দুর্মূল্য দীপ্তি হঠাৎ বেরিয়ে পড়বে। তার আগে পর্যন্ত হেসো।'...

ছবি আকার এবং তার প্রদর্শনীর ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মনের

মধ্যে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংশয়, আশা-আকাঙ্ক্ষা স্তরে স্তরে জমা হয়েছিল সে সব একটু একটু করে তারই লেখা কালো কালির অক্ষরে এ গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। এ গল্পের শেষে অভীকের লেখা চিঠির স্থানে স্থানে ভাষা কি করুণ, কি বাস্তব। সমস্ত উপেক্ষা, অবজ্ঞাকে দু'পায়ে ঠেলে জয়ের নেশায় পাগল এক উচ্ছল তরুণ চলেছে সাগর পারে।

রবীন্দ্রনাথও বাস্তব ক্ষেত্রে ছিলেন তাই। তিনি জানতেন, তাঁর ছবির প্রশংসা অনেক স্থানে মিথ্যার ছলনামাত্র। তাঁর সমালোচক মন বলত, ও ছাবিগুলো ছেঁড়া কাগজের বেশী দাম এখানে পাবে না। তবু তিনি অভীকের মত উচ্ছল এক তরুণের মন নিয়ে ছুটে গিয়েছেন বিশ্বের এ প্রান্তে ও প্রান্তে। এ-দেশের উপেক্ষাকে তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন—তাঁর শিল্পীমন, শিল্পী-সত্তা তখনো শুকিয়ে যায় নি।

'রবিবার' এরই জীবন্ত ও উজ্জ্বল প্রতিফলন।

এই প্রসঙ্গে, প্যারিস থেকে ইন্দিরা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির কিছু অংশ তুলে ধরছি। এই চিঠির মাধ্যমেই 'রবিবার' গল্পের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের সম্পর্ক পরিস্ফুট হবে।

পোস্টমার্ক
প্যারিস

কল্যাণীয়াসু,

তোর চিঠি পেয়ে খুসি হলাম। ঘুরে ফিরে প্যারিসে এসেছি। এখন বৈশাখের মাঝামাঝি। কিন্তু বৈশাখ বলে পদার্থ এখানে কোথাও নেই। মেঘ করে আছে, থেকে থেকে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে, বাতাসকে শীতল বলা যায়। আর মেঘ-শয্যায় যে সূর্যদেব লীনপ্রায় আছেন—তাঁকে মার্তণ্ড বললে বেমানান শোনায়। এই তো গেল আকাশের খবর। ধরাতলের যে রবিঠাকুর বিগত শতাব্দীর ২৫শে

আটার

বৈশাখ অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁর কবিত্ব সম্প্রতি আচ্ছন্ন—তিনি এখন চিত্রকর রূপে প্রকাশমান—তার সম্পূর্ণ বিবরণ যখন পাবি তখন চমক লাগবে, কিন্তু নিজ মুখে এ সম্বন্ধে সত্য কথা বলতে গেলে অহংকার করা হয়। পরম্পরায় যখন শুনবি তখনকার জন্যে নীরবে অপেক্ষা করাই ভালো। ২রা মে তারিখে প্রদর্শনীর দ্বারোদ্মোচন। এইবার আমার চৈতালি।—বর্ষশেষের ফসল সমুদ্র-পারের ঘাটে সংগ্রহ হল। আমার পরম সৌভাগ্য এই যে, আমাদের নিজপারের ঘাট পেরিয়ে এসেছি। আমার এই শেষ কীর্তি এই দেশেই রেখে যাব।···

ইতি ২৬ এপ্রিল ১৯৩০

রবিকাকা

'রবিবারের' মত 'চিত্রকর' গল্পেও রবীন্দ্রনাথ শিল্পীজীবনের দুঃখ বেদনাকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন।

এখানে তিনি একটি আদর্শকে তুলে ধরেছেন। সে আদর্শ শিল্পীর শিল্পমনের যথার্থ প্রকাশকে নিয়ে।

সত্যবতী বিধবা।

একমাত্র পুত্রকে সঙ্গে করে স্বামী মুকুন্দর নির্দেশমত তাব ভাই গোবিন্দর আশ্রয়ে এল।

গোবিন্দ প্রথম থেকেই ভ্রাতুষ্পুত্রকে কানে মন্ত্র দিল—'পয়সা করো।'

বাধ সাধলেন সত্যবতী।

শিশুকাল থেকেই সত্যবতীর বাতিক ছিল শিল্পকাজে। স্বামীর দিক থেকে কোনদিন এ ব্যাপারে বাধা আসেনি। পরন্তু অবাধ উৎসাহ ও অবুঝের বাহবা কুড়িয়েছেন এতকাল। এমন দুর্লভ সৌভাগ্যকেও সত্যবতী হারালো একদিন। গোবিন্দ তার নির্মম শাসনের বেড়াজালে সত্যবতী ও তার পুত্রের শিল্পীসত্তাকে নিঃশেষে শুকিয়ে মারতে চাইল।

উনষাট

°তবু এদের শিল্পসাধনা চলল অতি নিভৃতে, গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে। যদিও তাদের হাতে যে সব জন্তুর মূর্তি রূপ পেত, বিধাতা এখনো তাদের সৃষ্টি করেন নি। একেবারে ছেলেমানুষিব একশেষ।

ঘটনা চরমে উঠল একদিন।

সকালে শ্রাবণের আকাশের মত মা-ছেলের মনের আকাশও অন্ধকার হয়ে এল।

'সত্যবতী এতদিন গোবিন্দর কোনো ব্যবহারে কোনো কথা বলেন নি। এঁরই 'পরে তাঁর স্বামী নির্ভর স্থাপন করেছেন। এই স্মবণ করেই তিনি নিঃশব্দে সব সহ্য করেছেন। আজ তিনি অশ্রুতে আর্দ্র হয়ে ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে বললেন,—'কেন তুমি চুনির ছবি ছিঁড়ে ফেললে?'

গোবিন্দ বললেন—'পড়াশুনা করবে না? আখেবে ওর হবে কী'।

সত্যবতী বললেন—'আখেবে ও যদি পথেব ভিক্ষুক হয় সেও ভালো। কিন্তু, কোনদিন তোমাব মতো যেন না হয়। ভগবান ওকে যে সম্পদ দিয়েছেন তারই গৌরব যেন তোমার পয়সার গর্বের চেয়ে বেশি হয়, এই ওর প্রতি আমার মায়ের আশীর্বাদ।'

সত্যবতী বেরিয়ে গেলেন সেই মুহূর্তে পুত্রের হাত ধরে যেখানে পাবে সত্যিকারের সম্মান আর স্বাধীনতার আশ্বাস।

যাবার আগে সত্যবতী তাঁর সমস্ত ধৈর্য ও নীরবতাব বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে গোবিন্দকে যে কথা বলে চলে গেলেন সে কথা প্রকাশ-ভঙ্গিব মধ্য দিয়ে কত বড় হয়ে বেজেছে চিন্তা করা যায় না। মানুষেব জীবন যে শুধুমাত্র খাওয়া-পরা আব মাথা গোঁজবার চিন্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এ ছাড়াও তার একটা নিজস্ব জগৎ আছে যেখানে সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারে। সে প্রকাশের মধ্য দিয়ে আনন্দরস পান করতে পারে—একথা নারী হয়েও সত্যবতী যতখানি বুঝেছেন গোবিন্দ চার-দেওয়ালের বাইরে থেকেও তা মোটেই উপলব্ধি করতে

পারেন নি। এটাই সত্যবতী চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে যেতে চেয়েছেন।

সত্যবতী রবীন্দ্রনাথের এক প্রতীক চরিত্র। রবীন্দ্রনাথ মনের গোপন কথাকে সত্যবতীব মধ্য দিয়ে বিদ্রোহীর মত বলাতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের দরদী লেখনীতে চরিত্রটি পাঠকের মর্ম স্পর্শ করে অতি সহজেই।

শিল্পীর জন্য ধন নয়, মান নয়, নয় কোন ঐশ্বর্য। দারিদ্র্যের মধ্যেই তার সাধনা, এর মধ্যেই তার যথার্থ প্রকাশ। এতেই তার মুক্তি। —গল্পটির মধ্য দিয়ে এই সত্যই যেন বারে বারে ধ্বনিত হয়ে উঠছে।

'লিপিকা' রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের রচনা।

যখন সাহিত্যের অনন্ত পথ পেরিয়ে আসতে আসতে তিনি ক্লান্ত, শ্রান্ত, তখন মানসিক বিশ্রামের আশায় হাল্কা লেখায় মনোনিবেশ করেন।

এই 'লিপিকার'ই 'প্রাণমন' অংশে আছে—

"আমার জানালার সামনে রাঙা মাটির রাস্তা।

ওখান দিয়ে বোঝাই নিয়ে গোরুর গাড়ি চলে; সাঁওতাল মেয়ে খড়ের আঁটি মাথায় কবে হাটে যায়, সন্ধ্যাবেলায় কলহাস্যে ঘরে ফেরে।

কিন্তু মানুষের চলাচলের পথে আজ আমার মন নেই।

জীবনের যে ভাগটা অস্থির, নানা ভাবনায় উদ্বিগ্ন, নানা চেষ্টায় চঞ্চল, সেটা আজ ঢাকা পড়ে গেছে। শরীর আজ রুগ্ন, মন আজ নিরাসক্ত।"—

'লিপিকা'তে আছে টুকরো টুকরো ঘটনা। এসব ঘটনায় একদিকে যেমন স্থান পেয়েছে মিনুর মত ছোট মেয়ের মনের কথা তেমনি রয়েছে রাজা, রাজপুত্তুর, সুয়োরাণীর মত আরো অনেক কিছু। মনে

হয়, বাস্তব ও কল্পনা, সত্যি আর মিথ্যে এরা দুই ভাই একত্রিত হয়ে নূতন রূপে হাতে হাত মিলিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের লেখা বলেই হয়তো এখানে কাহিনীর মাঝে মাঝে 'চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ' এসে উঁকি দিয়েছেন।

'ভুল স্বর্গ' কাহিনীতে রয়েছে—

—'লোকটা নেহাত বেকার ছিল।

...দূতগুলো মার্কা ভুল করে তাকে কেজো লোকের স্বর্গে রেখে এলো।

এই স্বর্গে অন্দর সবই আছে, কেবল অবকাশ নেই।

ভারি এক ব্যস্ত মেয়ে স্বর্গের উৎস থেকে রোজ জল নিতে আসে।...

...বেকার বললে,—"তোমার হাত থেকে কাজ নেব বলে দাঁড়িয়ে আছি।"

"কী কাজ দেব।"

"তুমি যে ঘড়া কাঁখে করে জল তুলে নিয়ে যাও, তারই একটি যদি আমাকে দিতে পার।"

"ঘড়া নিয়ে কী হবে। জল তুলবে?"

"না, আমি তার গায়ে চিত্র করব।"

মেয়েটি বিরক্ত হয়ে বললে,—"আমার সময় নেই, আমি চললুম।"

কিন্তু বেকার লোকের সঙ্গে কাজের লোক পারবে কেন। রোজ ওদের উৎসতলায় দেখা হয় আর রোজ সেই একই কথা।" তোমার কাঁখের একটি ঘড়া দাও তাতে চিত্র করব।"

হার মানতে হল, ঘড়া দিলে।

সেইটিকে ঘিরে ঘিরে, বেকার আঁকতে লাগল কত রঙের পাক, কত রেখার ঘের।

আঁকা শেষ হলে মেয়েটি ঘড়া তুলে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে। ভুরু বাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "—এর মানে?"

বেকার লোকটি বললে, "এর কোনো মানে নেই।"

বাস্তবে, রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির মধ্য থেকেও এই 'মানে' কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছে করেই যেন হারিয়ে যেতে দিয়েছেন তাকে। আর এমনি করেই অবসন্ন চেতনার মাঝে নিজেকে খুঁজে পেতে চেয়েছেন। নিজের শ্রান্ত দেহকে বিশ্রাম দিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করছি।—

রবীন্দ্রনাথ তখন বিলেতে। সেখানে তাঁর ছবির প্রদর্শনী চলছে। সে সময় ও-দেশের এক পণ্ডিত ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'কবি, তুমি এমন অদ্ভুত অদ্ভুত ছবি আঁক কেন? দেখে মনে হয় যেন কোন জন্তু, কিন্তু বিশ্বের কোনো জন্তুর সঙ্গেই তার মিল নেই। এর মানে কি?

রবীন্দ্রনাথ এর উত্তরে বললেন, "—ঈশ্বর যে ডিনোসউর, হিপোপটেমাস্ এবং আরো কত যে কিম্ভূতকিমাকার জন্তু সৃষ্টি করেছেন তার মানে কি? আমার ছবির সম্বন্ধেও সেই কথা—কোনো মানে নেই।"

'পট' কাহিনীতে শিল্পী অভিরামের মধ্য দিয়ে ছবির সঙ্গে সঙ্গে শিশুমনের জয়গান করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

ছবি শুধু ছবিই নয়—তা মনের প্রতিফলন, শুদ্ধতার প্রতিফলন। সেই মনের আঙ্গিনায় কোনো শিশুমন যদি কেঁদে ফিরে যায় তবে সে শিল্প যথার্থ রূপ পায না।

তাই সেইদিনই পট নিয়ে গিয়ে মন্ত্রীকে অভিরাম বললে—'এই নাও সেই পট, তোমার ছেলেকে দিও।'

মন্ত্রী বললে,—'কত দাম।'

অভিরাম বললে,—'আমার দেবতার ধন তুমি কেড়ে নিয়েছিলে, এই পট দিয়ে সেই ধ্যান ফিরে নেব।'

রবীন্দ্রনাথের এ লেখা শুধু অভিরাম শিল্পীর জন্যই নয়, চিরকালের

শিল্পীদের উদ্দেশ্য করেই লেখা। তাদের চোখের সামনে এক আলোর পথ খুলে দেওয়া।

'গুপ্তধন' গল্পের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে একটু থামতে হবে।

একটি ছবি।

বহু যত্নে, নানা বর্ণে রঞ্জিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কত ভাব, ভাবনা, চিন্তা একত্রে আকুলিত হয়ে উঠেছে এ ছবিতে।

…"ডাকিতে ডাকিতে মৃত্যুঞ্জয়ের গলা ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু দ্বার খুলিল না।…তখন সোনাগুলিকে দেখিয়া তাহার আতঙ্ক হইতে লাগিল।'

একটুকু আকাশ, বাতাস, আলোর জন্য মৃত্যুঞ্জয়ের প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠল। আর সোনা নয়, শুধু মুক্তি নিয়ে বাইরে আকাশের নীচে এসে দাঁড়াতে চায় মৃত্যুঞ্জয়। সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্য থেকে কল্পনায় বাইরের চির পরিচিত রূপটিকে মনের মধ্যে আবার সে এঁকে নিতে লাগল—"পৃথিবীতে এখন কী গোধূলি আসিয়াছে? আহা, সেই গোধূলির স্বর্ণ! —যে স্বর্ণ কেবল ক্ষণকালের জন্য চোখ জুড়াইয়া অন্ধকারের প্রান্তে কাঁদিয়া বিদায় লইয়া যায়। তাহার পরে কুটিরের প্রাঙ্গণতলে সন্ধ্যাতারা একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। গোষ্ঠে প্রদীপ জ্বালাইয়া বধূ ঘরের কোণে সন্ধ্যাদীপ স্থাপন করে। মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠে।"

……"তাহাদের সেই যে ভোলা কুকুরটা লেজে মাথায় এক হইয়া উঠানের প্রান্তে সন্ধ্যার পর ঘুমাইতে থাকিত, সে কল্পনাও তাহাকে যেন ব্যথিত করিতে লাগিল। ধারাগোল গ্রামে কয়দিন সে যে মুদির দোকানে আশ্রয় লইয়াছিল সেই মুদি এতক্ষণ রাত্রে প্রদীপ নিবাইয়া, দোকানে ঝাঁপ বন্ধ করিয়া, ধীরে ধীরে গ্রামে বাড়ি-মুখে আহার করিতে চলিয়াছে,—যদি রবিবার হয় তবে এতক্ষণে হাটের লোক যে যার আপন আপন বাড়ি ফিরিতেছে, সঙ্গচ্যুত

সাথিকে উর্ধ্বস্বরে ডাক পাড়িতেছে, দল বাঁধিয়া খেয়া নৌকায় পার হইতেছে; মেঠো রাস্তা ধরিয়া, শস্যক্ষেত্রের আল বাহিয়া, পল্লীর শুষ্ক বংশপত্র খচিত অঙ্গনপার্শ্ব দিয়া চাষি-লোক হাতে ছুটো-একটা মাছ ঝুলাইয়া মাথায় একটা চুপড়ি লইয়া অন্ধকারে আকাশভরা তারার ক্ষীণালোকে গ্রামে-গ্রামান্তরে চলিয়াছে।"

এখানে রবীন্দ্রনাথের কলমে কালো কালির সঙ্গে কত নানা রঙের যে পরস্পর সমন্বয় ঘটেছে সে কথা বলাই বাহুল্য।

শুধু রঙ আর রঙ। সঙ্গে সঙ্গে ছবির অপূর্ব প্রকাশ। এ তো কেবল মাত্র কথার সঙ্গে কথার বাঁধন নয়—কবিতার মত ছন্দের মিলও নয়। সবকিছুকে ছাড়িয়ে নিতান্ত পরিচিত এক পরিবেশকেই আবার নতুন করে প্রকাশ করা।

৭

অন্যদের উৎসাহ দানঃ

রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে।

বোটে বোটে ঘুরছেন। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছেন, আর তাদের ধরে রাখছেন কাব্যের মাধ্যমে। সাহিত্যের ভাণ্ডার হয়ে উঠছে বিস্তৃত।

এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা বর্ণনা করে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন—

শিলাইদহ

১৮৮৮

…শিলাইদহের অপর পারে একটা চরের সামনে আমাদের বোট লাগানো আছে। প্রকাণ্ড চব—ধূ-ধূ করছে—কোথাও শেষ দেখা যায় না—কেবল মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় নদীর রেখা দেখা যায়—আবার অনেক সময় বালিকে নদী বলে ভ্রম হয়—গ্রাম নেই, লোক নেই, তরু নেই, তৃণ নেই—বৈচিত্র্যের মধ্যে জায়গায় জায়গায় ফাটল

ধরা ভিজে কালো মাটি, জায়গায় জায়গায় শুকনো সাদা বালি—পূর্ব দিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখা যায় উপরে অনন্ত নীলিমা আর নীচে পাণ্ডুরতা, আকাশ শূন্য এবং ধরণীও শূন্য। নীচে দরিদ্র শুষ্ক কঠিন শূন্যতা আর উপরে অশরীরী উদার শূন্যতা। এমনতর desolation কোথাও দেখা যায় না। হঠাৎ পশ্চিমে মুখ ফেরাবামাত্র দেখা যায় স্রোতহীন ছোটো নদীর কোল, ওপারে উঁচু পাড়, গাছপালা, কুটির, সন্ধ্যা-সূর্যালোকে আশ্চর্য স্বপ্নের মতো। ঠিক যেন এক পারে সৃষ্টি এবং আর এক পারে প্রলয়। সন্ধ্যা-সূর্যালোক বলবার তাৎপর্য এই—সন্ধ্যার সময়ই আমরা বেড়াতে বেরোই এবং সেই ছবিটাই মনে অঙ্কিত হয়ে আছে। পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়। এই যে ছোট নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতি রাতে যত সহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎ সংসারে এ যে কী একটা আশ্চর্য মহৎ ঘটনা তা এখানে থাকলে তবে বোঝা যাবে।

সূর্য আস্তে আস্তে ভোরের বেলা পূর্বদিক থেকে কী এক প্রকাণ্ড গ্রন্থের পাতা খুলে দিচ্ছে এবং সন্ধ্যা পশ্চিম থেকে ধীরে ধীরে আকাশের উপরে যে এক প্রকাণ্ড পাতা উল্‌টে দিচ্ছে সেই বা কী আশ্চর্য লিখন …এরপর সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত যায়, আকাশের সুবর্ণ আভা মিলিয়ে যায়, অন্ধকারে চারদিক অস্পষ্ট হয়ে আসে। ক্রমে আপনার পাশের ছায়া ক্ষীণ দেখে বুঝতে পারি বাঁকা কৃশ চাঁদখানির আলো স্বল্প স্বল্প ফুটেছে —পাণ্ডুবর্ণ জ্যোৎস্নায় চোখে আরও কেমন বিভ্রম জন্মিয়ে দেয়— কোথায় বালি, কোথায় জল, কোথায় পৃথিবী, কোথায় আকাশ, নিতান্ত অনুমান করে নিতে হয়। কাজেই সবটা জড়িয়ে ভারী একটা অবাস্তবিক মরীচিকা-জগতের মতো বোধ হয়।…

এ চিঠিতে কবি রবীন্দ্রনাথ নয়, সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ নয়, শুধুমাত্র

শিল্পী রবীন্দ্রনাথই চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে তিনি চারদিক দেখেছেন। কলমের কালো অক্ষরে তা শুধু প্রকাশই করেন নি, তুলির আঁচড়ে সাদা কাগজের বুকে নতুনভাবে প্রকৃতিকে জন্ম দিয়েছেন। এ যেন প্রকৃতির কোন এক মুহূর্তকে হারিয়েও আবার ফিরে পাওয়া। চিঠিতেই ছবির পর ছবি এঁকে যাওয়া।

শুধুমাত্র এই চিঠিতেই নয়, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে লেখা বহু চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথ নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন প্রকৃতির এক একটি বিচিত্র রূপ আব সেই প্রকৃতির মাঝে বেড়ে ওঠা মানুষদের জীবনকথা। যেন সাদা পর্দার উপর একে একে ছবি ফুটে উঠেছে।

অসংখ্য ছবি পবস্পর।

অথচ এরা কেউ কাউকে ঈর্ষা করে না। কেউ কাউকে হারাতে দিতে চায় না। প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটি ছবি আপন মহিমায়, আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এবা রবীন্দ্রনাথের লেখনীর গুণে একসূত্রে বাঁধা। পরে অমূল্য কণ্ঠহার রচনা করেছে।

কিন্তু এতে রবীন্দ্রনাথ যেন খুশী নন।

সব কথা বুঝি লেখা হয় না।

বাদ থেকে যায় অনেক।

মনে মনে এক অতৃপ্তির বেদনা বেড়ে ওঠে।

প্রকৃতির এত রূপ, এত সৌন্দর্য সরাসরি তুলির আঁচড়ে ধরে রাখতে তার মন অধীর হয়ে উঠল। যেদিন যায় সেদিন আর আসে না। নিত্য নূতন রঙের ছটায় পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যেন মেতে ওঠে। ছেলেমানুষের মত তাঁর মনকে নিয়ে খেলা করে। রবীন্দ্রনাথ অসহায়ের মত সবকিছুর মাঝে দাঁড়িয়ে হতবাক্ হয়ে থাকেন।

লেখনী কিন্তু অনর্গল চলেছে বাঁধভাঙা স্রোতের মত। তবুও মন মানে না।

'বলাকা' কাব্যে ৪১নং কবিতাটিতে রয়েছে এরই পরিষ্কার প্রতিচ্ছবি।

'যে কথা বলিতে চাই ;
বলা হয় নাই,
সে কেবল এই—
চিরদিবসের বিশ্ব আঁখি সম্মুখেই
দেখিনু সহস্রবার
দুয়ারে আমার।
অপরিচিতের এই চির পরিচয়
এতই সহজে নিত্য ভরিয়াছে গভীর হৃদয়
সে-কথা বলিতে পারি এমন সরল বাণী
আমি নাহি জানি।
শূন্য প্রান্তরের গান বাজে ওই একা ছায়াবটে
নদীর এপারে ঢালু তটে
চাষি করিতেছে চাষ
উড়ে চলিয়াছে হাঁস
ওপারের জনশূন্য তৃণশূন্য বালু-তীর তলে।
চলে কিনা চলে
ক্লান্তস্রোত শীর্ণ নদী, নিমেষ নিহত
আধো জাগা নয়নের মতো।
পথখানি বাঁকা
বহুশত বরষের পদচিহ্ন আঁকা
চলেছে মাঠের ধারে, ফসল ক্ষেতের যেন মিতা,
নদীসাথে কুটিরের বহে কুটুম্বিতা।

ফাল্গুনের এ আলোয় এই গ্রাম, ওই শূন্য মাঠ,
ওই খেয়াঘাট,

ওই নীল নদীরেখা, ওই দূর বালুকার কোলে
নিভৃত জলের ধারে চোখাচোখি কাকলি কল্লোলে
যেখানে বসায় মেলা—এই সব ছবি
কতদিন দেখিয়াছে কবি।
শুধু এই চেয়ে দেখা, এই পথ বেয়ে চলে যাওয়া
ওই আলো, এই হাওয়া,
এইমত অস্ফুট ধ্বনির গুঞ্জরণ।
ভেসে-যাওয়া মেঘ হতে
অকস্মাৎ নদী স্রোতে
ছায়ার নিঃশব্দ সঞ্চরণ,
যে আনন্দ বেদনায় এ জীবন বারেবারে করেছে উদাস
হৃদয় খুজিছে আজি তাহারি প্রকাশ।

পদ্মা
৮ই ফাল্গুন ১৩২২

এরই মাঝে হঠাৎ মনে পড়ে যায় ভাইপোদের কথা। তাদের নিজের কাছে পেতে ইচ্ছে হয়। ইচ্ছে হয় তারাও দেখুক এসব, আর তুলির টানে অক্ষয় করে রাখুক কোন দিনের কোন চলমান মুহূর্ত।

তখনও কবি রবীন্দ্রনাথ, শিল্পী রবীন্দ্রনাথরূপে প্রকাশ পান নি। কুষ্টিয়ার জমিদার বলা চলে।

তিনি নামেই জমিদার।

জমির হিসেব-নিকেশ, পাওয়া-না-পাওয়ার কোন ব্যাপারেই, তাঁর মন নেই তেমন। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, পদ্মায় বোটে করে ঘুরছেন। সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত দেখছেন।

দেখছেন নানা রঙের ছটা পদ্মার কালো জলে। গ্রাম্য বধূরা সলজ্জ দৃষ্টিতে মৃদুমন্দ পদক্ষেপে জল নিয়ে ফিরে যায়। বকেরা

সন্ধ্যার আকাশে প্রায় অন্ধকার অবস্থায় বিদ্যুৎদৃষ্টির মত মিলিয়ে যায় দূর থেকে দূরে। রাতের আঁধারে নদীকে এক 'খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ারে'র মত মনে হয়।

গ্রাম-বাঙলার এ রূপ দু'চোখ ভরে উপভোগ করেন রবীন্দ্রনাথ।

তিনি আর অপেক্ষা করতে চাইলেন না।

ভাইপো গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথকে লিখে ফেললেন এক লোভনীয় চিঠি।

রবীন্দ্রনাথ চাইলেন, ওদের মত শিল্পীরা অন্তরে উপলব্ধি করুক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। গ্রাম-বাঙলার রূপ। যা ছবিকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলবে।—লাভ করুক অপরিসীম আনন্দ, সঙ্গে সঙ্গে তুলির মাধ্যমে দিয়ে যাক্ অন্যদেরও।

লিখলেন—

কল্যাণীয়েষু,

আমি শনিবার বোট নিয়ে কুষ্টিয়ায় তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব। রবিবার রাত্রে তোমরা না এলে ভারি অন্যায় হবে। চরের উপর জলচর পাখীদের সঙ্গে মিলে মিশে বাস করবার জন্য তোমাদের উদ্দেশে আমি আয়োজন করে রেখেছি। অতএব সে সমস্ত ব্যর্থ কোরো না—অনেক দেখবার, ভাববার, আনন্দ পাবার আছে। জোড়াসাঁকোর গলির মুখ থেকে প্রথমটা বেরোবার যে দুঃখ সেইটুকু কোনমতে কাটাতে পারলে এখানে এসে খুব আনন্দ পাবে সন্দেহ নেই। রথীকে খবর দিয়ো, আমি শনিবারে কুষ্টিয়ায় বোট নিয়ে যাব, আমাকে যেন বসিয়ে না রাখে—রবিবার রাত্রে তোমরা সকলে মিলে যেন এসে পড়তে পার। তিন আর্টিস্টে এখানকার জলস্থল আকাশ তোলপাড় করে বেড়াবে—অনেক কথা জমা আছে, দেখা হলে হবে।

ইতি, বৃহস্পতিবার

রবিকাকা।

বিধি বাধ সাধলেন।

রবীন্দ্রনাথের এ সকরুণ আবেদনেও সাড়া দিলেন না তার ঘরকুনো ভাইপোরা। জোড়াসাঁকোর গলির মুখ থেকে বের হবার দুঃখটুকু তাঁরা কোনমতে কাটিয়ে উঠতে পারলেন না।

রবীন্দ্রনাথ দুঃখিত হলেন—মনে মনে ব্যথা পেলেন।

অন্তরে বিষণ্ণতা বোধ করলেন।

কিন্তু দমলেন না। যা নিজের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেতে বিলম্ব হচ্ছিল, তাই অন্যদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করাতে তিনি যেন তখন বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত ওদেরই তিন ছাত্রকে শিলাইদহে টেনে নিয়ে গেলেন—তারা নন্দলাল, মুকুল ও সুরেন। এই তরুণ তিন শিল্পী যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। নতুন জগৎ দেখার আনন্দে তারা অভিভূত। তবু ওদের গুরুরা ধরা দিলেন না শিলাইদহের মাটিতে।

শুধু শিলাইদহে নয়।

বিশ্বের দরবার থেকে সম্মানের মুকুট মাথায় করে এনে রবীন্দ্রনাথ গগন-অবনদের বলেছিলেন, পাশ্চাত্ত্যদেশে তাদের চিত্র-প্রদর্শনী করতে।

কিন্তু রাজী করাতে পারলেন না।

প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের ছায়ায় যেমন পথিকেরা নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করে, নিদ্রা যায়, পাখীরা শাবকদের সঙ্গে কলগুঞ্জনে মেতে ওঠে, তেমনিভাবে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন অবন-গগনদের উৎসাহিত করতে নিজের আন্তরিকতার ছায়ায়—তাদের ছবির সুনাম প্রকাশে সাহায্য করতে।

জাপান থেকে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঘরকুনো ভাইপোদের লিখছেন,—'গগন, তোমরা কবে ঘর থেকে একবার বিশ্বজগতে বেরিয়ে পড়বে? তোমাকে তোমার নামের সার্থকতা করা উচিত।...শেষকালে অনেক ভেবেচিন্তে টাইক্কানের পরামর্শে আরাই নামক আর্টিষ্টকে তোমাদের ওখানে পাঠাচ্ছি।...

বিখ্যাত জাপানী শিল্পী ওকাকুরাও রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে এদেশে এসেছিলেন। এসেছিলেন জাপানী শিল্পের নিদর্শন, সেখানকার নতুন ঢং এখানে দেখাতে, শেখাতে।

গগন-অবন এতকাল নিজেদের দেশের রাজপুত, মোঘল ছবি দেখতেন, আঁকতেন। জাপানী ছবি তাঁদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন।

ওকাকুরাকে তাঁরা বললেন—এ তো হল, কিন্তু জাপানী আর্টিষ্টরা কেমন কাজ করে, এ না দেখলে মন ভরবে না।

ওকাকুরা বললেন—'বেশ তো, চলুন না। আমাদের দেশে দেখিয়ে দেব সব। খুব ভালো লাগবে আপনাদের।

—ওরে বাবা, ওটি হবে না। এই জোড়াসাঁকোর গলি ছেড়ে আমরা কোথাও নড়তে পাবব না।

শেষে ওকাকুরা বললেন—'বেশ, তবে আমিই তাদের পাঠিয়ে দেব। আমাদের শিল্পীরা এসে এখানেই ছবি এঁকে যাবে।

দেশে ফিরে তিনি টাইকান ও হিসিদাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই টাইকান পবে জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথও সমানে চেষ্টা করে গেছেন। ইয়োরোপে নিয়ে যেতে পারলেন না, ভাবলেন চীন তো প্রতিবেশী দেশ। এখানে ওদের যাওয়ার অসুবিধে কোথায়।

অবনীন্দ্রনাথ এর উত্তবে বললেন—'চলো, রবিকা, তোমায় বরং জাহাজঘাটা অবধি পৌঁছে দিয়ে আসি। জাহাজ তোমায় নিয়ে ধীরে ধীরে চীনের দিকে চলে যাবে, ওই দেখেই আমার চীন যাত্রা হবে। তাছাড়া আমার ছাত্র নন্দলাল তো রইল তোমার সঙ্গে।

আর কোথাও নয়, দক্ষিণের বারান্দাতেই তাদের ছবি আঁকার জগৎ গড়ে উঠেছিল। ওখানে বসে গগনেন্দ্রনাথ রুটির টুকরো ছুঁড়ে দিতেন। কাক এসে বসত।

এই সুযোগে তাদের নানান ভঙ্গি, চলার ঢং, রুটি মুখে উড়ে

খাওয়া, পাতায় পাতায় এঁকে নিতেন। এরপর হোলো ওরা রুটি খেতে এসে নিজেরাই নতুন নতুন ভঙ্গি নিয়ে খেত, চলত। যেন তারা বুঝতে পেরেছে ছবি আঁকবে তাদের।

কোনো ছেলে বারান্দায় এলে গগন সাবধান করে বলতেন—এই কাছে যাসনে, ওরা এখন ছবি আঁকাচ্ছে।

যখন গগন-অবনদের পাওয়া গেল না তখন রবীন্দ্রনাথ নন্দলালকেই সঙ্গে নিলেন। শুধু চীনে নয়, বিভিন্ন দেশে নন্দলাল তাঁর সঙ্গী হলেন।

একমাত্র রক্তের সম্বন্ধই রবীন্দ্রনাথের কাছে কোনদিন বড় হয়ে দেখা দেয় নি। নন্দলাল পরিবারেব কেউ না হলেও তার উপর স্নেহের টান ছিল যথেষ্ট। সর্বোপবি যে শিল্পী, তার চোখের সামনে থেকে অজানার কালো পর্দাটা সম্পূর্ণ সবে যাক্, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তাব পরিচয় ঘটুক, এটাই তিনি চাইতেন।

নন্দলালকে তিনি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শিল্পাদর্শ, টেকনিক দেখবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে নন্দলাল ভারতীয় আদর্শ, শিল্পের রীতিনীতি ছড়িয়েছেন বিদেশে। তাঁর মাধ্যমেই গুরু অবনীন্দ্রের নাম কারো কাছে অজানা থাকে নি।

নন্দলাল ফিবে এসে বিদেশকে স্বদেশের দ্বাবে এনে দিয়েছিলেন। এর ফলে বাইরের সঙ্গে এখানকাব শিল্পের অপূর্ব সমন্বয় হোলো। পরবর্তীকালে তারই প্রতিফলন এদেশের বহু শিল্পীর তুলিতে প্রকাশ পায়।

এসবের মূলেই ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

তিনি যদি শিল্পের সম্বন্ধে এত গভীরভাবে চিন্তা না করতেন, ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে না ভাবতেন, তবে আজও বহুজনের কাছে বাইরের স্টাইল অজানার অন্ধকারে থেকে যেত, একথা অনস্বীকার্য।

আমেরিকার ঠিকানা—
C/o. Prof. Seymonn
Urbana, Illinois
U. S. A.

ভাই জ্যোতিদাদা

গত মেলে আপনার চিঠি পেয়েছি কিন্তু ছবির খাতা এসে পৌঁছতে বোধ হয় দু-এক মেল দেরি হতেও পারে। আমরা আবার পর্শু আমেরিকায় যাত্রা করচি। এখানে বলে দিয়ে যাব খাতা এসে পৌঁছুলে Rothenstein-এর কাছে পাঠিয়ে দিতে। তার সঙ্গে ঠিক করচি আপনার ছবি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ এখানকার studio কাগজে এবং আমাদের Modern Reviewতে লিখতে। তাতে কিছু কিছু উদাহরণ আপনার খাতা থেকে সংগ্রহ করে দিতে পারেন। ছবির বই ছাপতে এত বেশি খরচ যে, সে আপনাকে অনুরোধ করতে সাহস করিনে। একটা প্রস্তাব আছে এই যে, Indian Society থেকে আপনার ছবির গোটাকতক selection যদি ওরা ছাপায় তাহলে অনেকটা প্রচার হতে পারবে। আপনি কিছু খরচ দিলে ওরা বাকি খরচ দেবে।…আর বছর আপনার এটা যদি ওরা ছাপিয়ে দিতে রাজী হয় তা হলে খুব ভালো হবে। আমি আজ ওদের কাছে সেই প্রস্তাব করব।……

ইতি ১লা কার্তিক ১৩১৯
স্নেহের রবি।

শুধুমাত্র নিজের জন্য নয়, আত্মীয় অনাত্মীয় সকলের জন্যই যথাসাধ্য করার দিকে তাঁর মন সর্বদা ব্যস্ত থাকত। সুদূর আমেরিকা এসেও তিনি নিশ্চিন্ত হন নি। জ্যোতিদাদার ছবি পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য লেগে গেলেন। বিদেশে সে ছবির যাতে কদর হয়, সকলের চোখের সামনে যাতে আসতে পারে সে ব্যাপারে পন্থা

উদ্ভাবনের চেষ্টায় প্রয়াসী হলেন। কার কার সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে সে বিষয়েও ভেবে রেখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' লিখে এক সময় মনে মনে ভাবলেন, এ বইয়ের যা স্বাদ তা যদি ছবির মুখে ফোটানো যায় তবে কেমন হয়। আর তখন তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি মুখ—গগন, গগনেন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে এরপর গগন একটার পর একটা ছবি এঁকে চললেন 'জীবনস্মৃতি'র। সে সমস্ত ছবি লেখার সঙ্গে অদ্ভুত মিল খেলো।

ভাইপোরা রবীন্দ্রনাথের এসব কাজের ঋণ স্বীকার করে গেছেন অকুণ্ঠচিত্তে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর একটি বইতে লিখছেন,—'বিয়ে হয়েছে, রীতিমত ঘর-সংসার আরম্ভ করেছি। কিন্তু ছবি আঁকার ঝোঁকটা কিছুতেই গেল না। তখন এই পর্যন্ত আমার বিদ্যে ছিল যে, নর্থ লাইট মডেল না হলে ছবি আঁকা যায় না। আর স্টুডিয়ো না হলে আর্টিষ্ট ছবি আঁকবে কোথায় বসে? বসলুম পাকাপাকি স্টুডিয়ো ফেঁদে। রবিকা খুব উৎসাহ দিলেন। সেই স্টুডিয়োতেই সেই সময় রবিকা 'চিত্রাঙ্গদা'র ছবি আঁকতে আমায় নির্দেশ দিচ্ছেন,—ফোটোতে দেখছো তো? চিত্রাঙ্গদা তখন সবে লেখা হয়েছে, রবিকা বললেন—ছবি দিতে হবে।'

আমার একটু সাহসও হয়েছে তখন। বললুম—'রাজি আছি।' সেই সময় চিত্রাঙ্গদার সমস্ত ছবি নিজ হাতে এঁকেছি, ট্রেস করেছি। চিত্রাঙ্গদা প্রকাশিত হল। এখন অবশ্য সে সব ছবি দেখলে হাসি পায়।

এই হল রবিকাকার সঙ্গে আমার প্রথম আর্ট নিয়ে যোগ। তারপর থেকে এতকাল রবিকার সঙ্গে বহুবার আর্টের ক্ষেত্রে যোগাযোগ হয়েছে, প্রেরণা পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। আজ মনে হয় আমি যা-কিছু করতে পেরেছি তার মূলে ছিল তাঁর প্রেরণা।"

অবনীন্দ্রনাথের এ উক্তির মধ্যে কোথাও সামান্যতম জড়তা নেই— সমস্ত পারিপার্শ্বিকতাকে উপেক্ষা করে নিজেকে বড় বলে দেখানোর কোন প্রয়াস নেই। এখানেই তিনি রবিকাকার উপযুক্ত ভাইপো বলে প্রকাশ পেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ভাইপোদের কাছে কয়েকবার বেড়ানোর প্রস্তাব দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন এবং তার জন্য বেদনা বোধ করেছেন ঠিকই, কিন্তু মনের এক কোণে কখন কিভাবে ওদের জন্য বিন্দু বিন্দু করে স্নেহের পাত্র ভরে তুলেছিলেন খেয়াল ছিল না।

সেই স্নেহ ও ভালোবাসা প্রকাশের দু-একটি তুলে দেওয়া গেল— "অবন কী আশ্চর্য মানুষ, সত্যিই আর্টিষ্ট। ওর তুলিতেও ছবি, কলমেও ছবি। একেবারে নিজস্ব স্টাইল। ওর যদি ভালো করে জয়ন্তী না করা হয় তাতে ওর কোনো ক্ষতি হবে না, হবে দেশের কলঙ্ক। ও একটা পাগলা! 'রবিকার' উপর চিরকাল বেজায় টান।"

অভিনয় ও ছবি আঁকা ছাড়া ভ্রাতুষ্পুত্রদের লেখা নিয়েও রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করতেন—"রং মহলে (রং মশালে) তোমার (অবনের) লেখাটা পড়ে ভারি মজা লাগল। এরকম বিশুদ্ধ পাগলামির কারুশিল্প আর কারো কলম দিয়ে বেরোবার জো নেই।'—

পর পর দু'খানা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ অবনের 'ঘরোয়া' বইয়েরও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। (প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৮)

অবনীন্দ্রনাথের মত শ্রীমুকুল দে রবীন্দ্রনাথের ঋণ লিখে জানিয়ে গেছেন। লিখেছেন কিভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আঁকায় প্রেরণা জুগিয়েছেন। উৎসাহ দান করেছেন।

শান্তিনিকেতন।

গাছতলায় একমনে ছবি এঁকে চলেছেন মুকুল দে। সমস্ত মন ছবির উপর ঢেলে দিয়ে তুলি টেনে যাচ্ছেন।

এরমধ্যে কখন এক সৌম্যকান্তি মূর্তি পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, মুকুল দে তা মোটেই খেয়াল করেন নি।

মূর্তিটি পেছনে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকা লক্ষ্য করে যাচ্ছে।

এক সময় ছবি আঁকা শেষ হোলো। মুখ তুলে তাকাতেই পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল মুকুলদের। লজ্জিত মুখের উপর কৌতুকের-হাসি-আঁকা-চোখ রেখে মুকুলকে সঙ্গে আসতে ইঙ্গিত করলেন।

নিজের ঘরে এসে বার করলেন ছবি আঁকার জন্য লম্বা লম্বা বড় কাগজ আর পেনসিল, তুলি ইত্যাদি। তুলে দিলেন ওর হাতে। ততক্ষণে কৃতজ্ঞতায় মুকুলের সারা মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য মুকুল দে।

বাল্যকাল থেকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র। তখন থেকেই তার প্রতিভা লক্ষ্য করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'কথা-সাহিত্য' পত্রিকার শতবার্ষিকী সংখ্যায় (১৩৬৮) মুকুলচন্দ্রের সে ইতিহাস সুন্দরভাবে লেখা আছে। কবি তাঁকে নিয়ে গেলেন জাপানে ও আমেরিকায়—দেখিয়ে আনলেন বাইরের দেশের শিল্পীদের তুলির অপরূপ কাজ। বিলেতে ম্যুর হেডবোনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাকে পরিচয় করিয়ে দেন—এর ফলে মুকুলচন্দ্রের পক্ষে বিলেতে আর্ট শিক্ষার সুযোগ হয়।

জাপান ও আমেরিকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মুকুল দে'র পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, যদি স্কেচ-আঁকা শিখতে হয় তবে এর কাছ থেকে শিখো।

রবীন্দ্রনাথের reccommend-এই মুকুল দে Calcutta Govt. Art School-এ অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন।

রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর জন্মোৎসরের পর রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির প্রদর্শনী হয় মুকুলচন্দ্রের উৎসাহে।

৮

ছবির আলোচনা ঃ

'সে' বইয়ের উৎসর্গপত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুহৃদ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে লিখেছেন—

…আমারো খেয়াল-ছবি মনের গহন হতে
ভেসে আসে বায়ুস্রোতে।
নিয়মের দিগন্ত পারায়ে
যায় সে হারায়ে
নিরুদ্দেশে
বাউলের বেশে।

যেথা আছে খ্যাতিহীন পাড়া
সেথায় সে মুক্তি পায় সমাজ-হারানো লক্ষ্মীছাড়া
যেমন-তেমন এরা বাঁকা বাঁকা
কিছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে আঁকা
দিলেম উজাড় করি ঝুলি।

লও যদি লও তুলি,
রাখো ফেলো যাহা ইচ্ছা তাই—
কোনো দায় নাই।

ফসল কাটার পরে
শূন্য মাঠে তুচ্ছ ফুল ফোটে অগোচরে
আগাছার সাথে
এমন কি আছে কেউ যেতে যেতে তুলে নেবে হাতে—
যার কোনো দাম নেই
নাম নেই,
অধিকারী নাই যার কোনো
বনশ্রী মর্যাদা যারে দেয় নি কখনো॥

পৌষ, ১৩৪৩
শান্তি নিকেতন।

শেষ জীবনের অলস মুহূর্তগুলো যখন হাতের মুঠোর মধ্যে আসে তখন মানুষের মনে কোন এক খেয়ালীপনা জেগে ওঠে। নিজেকে সে কেমনভাবে প্রকাশ করবে, কোন্ পথে পরিচালিত কববে তা নিয়ে মনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়।

ববীন্দ্রনাথ ঠিক সেই বয়সে ছেলেবেলার দিনগুলিতে ফিরে গেলেন। শিশুর মত মেতে উঠলেন ছবি আঁকার খেলায়।

ছবিতে কি ফুটে উঠেছে, কেন উঠছে, কাকে ফোটাতে হবে এসব প্রশ্ন তখন কোথায় ভেসে গেছে কে জানে। মনের মধ্যে সৃষ্টির জোয়ার শুধু উঠছে আর নামছে। তাই তাঁকে দেখি অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ বা নন্দলালের মত পরিপাটি করে নয়, শুধুমাত্র সাধারণ এক পেনসিলই তাঁর খেলার সঙ্গী।

তাঁর ছবি কোনো নিয়ম, কোনো ছন্দ, কোনো মাত্রা জানে না,

হাই তোলে বাঘে,— খাপছাড়া ।

। বিশ্বভারতীর সৌজন্যে ।

‘ছোট বৌ’—খাপছাড়া

। বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

মানেও না। এসবের বাধা ডিঙ্গিয়ে নিয়মের যুক্তি অগ্রাহ্য করে তাদের বিচরণ রবীন্দ্রনাথের হাতে।

রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কার ভাষায় জানাচ্ছেন। তাঁর সৃষ্টি কোনো খ্যাতি চায় না, চায় না কোনো আদরের আতিশয্য। শুধু মানুষের অগোচরে শূন্য মাঠে আগাছার সাথে এক হয়ে মিশে যেতে চায়। কেননা এসব ছবির তো কোনো আভিজাত্য বা কৌলীন্য নেই।

—"ক্ষণে ক্ষণে মনে আসে বৈরাগ্য। বসে বসে ছবি আঁকব, অল্পসল্প যা পারি তাই কাজ করব, অধিক কিছুই আশা করি না।"

(রথীন্দ্রনাথকে লেখা এক চিঠি।)

তাঁর ছবির অদ্ভুত আকৃতি, বাস্তব জগতের সঙ্গে অনেকেরই হয়তো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। মিল খোঁজার কোনো তাগিদও নেই। বছরের পর বছব মানুষ নিজের জীবনের হিসেবের খাতায় মিল খোঁজে, মিল করার আপ্রাণ চেষ্টা করে, শেষে হয়তো হেরেও যায়। এই হারের মধ্যে দুঃখ আছে, কষ্ট আছে—কিন্তু অন্যপক্ষে অমিল খোঁজার মধ্যে যে প্রাণখোলা আনন্দ তা আর কিছুতেই নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবিতে অমিল খোঁজার মধ্য দিয়েই আনন্দ পেতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া' বইতে যে সব ছবি আছে তাদের মধ্যে আকৃতির দিক দিয়ে অদ্ভুত ভাব লক্ষ্য করা যায়। তারা কারো আকৃতির প্রতিরূপ নয়। নিজেরাই নিজেদের উপমা।

এখানে অনেক ছবি সামান্য কয়েকটি আঁচড়েই ফুটে উঠেছে। আবার কতকগুলি ছবিতে দেখা যায় তিনি খেয়ালের বশে আঁচড়ের পর আঁচড় কেটেছেন। এই রকম কতকগুলি ছবি মনে হয় সহজে কারো কাছে ধরা দিতে চায় না।

৬৯ নম্বর ছবিটি একটি সিঁধকাটার ছবি। এখানে অসংখ্য আঁচড়ের অন্ধকারে বসে একটি মানুষ যে তার কাজ করে যাচ্ছে সে আভাস পাওয়া ততো কঠিন নয়।

রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় কবুল করেছেন—"ছবিতে নাম দেয়া একেবারে অসম্ভব। তার কারণ আমি কোনো বিষয় ভেবে আঁকিনি—দৈবক্রমে কোনো অজ্ঞাতকুলশীল চেহারা চলিত কলমের মুখে খাড়া হয়ে ওঠে। জনকরাজার লাঙলের ফলার মুখে যেমন জানকীর উদ্ভব।"...

কিন্তু তাঁর 'খাপছাড়া' ও 'সে' বই সম্বন্ধে এ কথা মোটেই প্রযোজ্য নয়। 'সে' বইতে ছবির সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাহিনীর জাল বুনেছেন। আর 'খাপছাড়া'তে ছবির নামই শুধু নয়, তাদের পরিচয় দিয়েছেন বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত প্রকৃতিকে প্রকাশ করে। যেমন—

পাঠশালে হাই তোলে
মতিলাল নন্দী ;
বলে, 'পাঠ এগোয় না
যত কেন মন দি'।...

বা হাতে কোনো কাজ নেই,
নওঁগার তিনকড়ি
সময় কাটিয়ে দেয়
ঘরে ঘরে ঋণ করি।...

বা নাম তার ভেলুরাম ধুনিচাঁদ শিরশ্ব,
ফাটা এক তম্বুরা কিনেছে সে নিরর্থ।...

বা ভূত হয়ে দেখা দিল
বড়ো কোলাব্যাঙ—
একপা টেবিলে রাখে,
কাঁধে এক ঠ্যাঙ।...

মুখ্যতঃ এ পরিচয়েরই জন্যই ছবিগুলো অদ্ভুত হয়েও, পাঠকদের কাছ থেকে মমতা আদায় করে। এখানে অধিকাংশ ছবি পেনসিলের আঁচড়ের মধ্য দিয়ে রূপ পেয়েছে, আর অল্প কিছু ছবি জল রঙে আঁকা।

'সে' গ্রন্থটি বাংলা ১৩৪৪ সালের বৈশাখ মাসে প্রথম প্রকাশ লাভ করে। এতে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং চিত্রিত করেন। কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে ছবির শোভাযাত্রাও চলেছে এখানে।

'সে' গ্রন্থের সূচনাতে তিনি উল্লেখ করেন, বিধাতা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ সৃষ্টি করে চলেছেন, তবু মানুষের আশা মেটে না; বলে আমরা নিজে মানুষ তৈরি করব।...

নাতনির ফরমাসে কিছুদিন থেকে লেগেছি মানুষ গড়ার কাজে; নিছক খেলার মানুষ, সত্যি মিথ্যার কোনো জবাবদিহি নেই। গল্প যে শুনছে তার বয়স ন'বছর, আর যে শোনাচ্ছে সে সত্তর পেরিয়ে গেছে। কাজটা একলাই সুরু করেছিলুম, কিন্তু মালমশলা এতই হাল্‌কা ওজনেব যে নির্বিচারে পুপুও দিল যোগ। আব একটা লোককে রেখেছিলুম, তার কথা হবে পরে।"

শূন্যের উপর রাজপ্রাসাদ কেন, সামান্য কুঁড়েঘর করাও অকল্পনীয়। তাসেব ঘরের মতই তা ভিত্তিহীন, অবাস্তব ব্যাপার। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে সাহিত্যের আঙ্গিনায় এটা মোটেই অসম্ভব কিছু নয়। এখানে বাস্তব পৃথিবীর নরনারীর জীবনকাহিনী যেমন পরিবেশিত হয় তেমনি কল্পজগতের রাজপুত্র-রাজকন্যা, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীদের কাহিনীও এসে ভিড় জমায়। উভয়ের কেউ কাউকে অবজ্ঞা করে না। অবহেলা করে না। পাঠকের কাছে তারা সমান দাবী নিয়ে হাজির হয় পাশাপাশি।

রবীন্দ্রনাথ 'সে' গ্রন্থটিতে কল্পনার লাগাম ছেড়ে দিয়েছেন খুশিমতন। এখানে সত্যি-মিথ্যে, বাস্তব-কল্পনা, একাকার হয়ে গেছে। মুখোমুখি শুধু দুটি মানুষ। ন'বছরের নাতনি পুপু আর সত্তর বছরের বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ।

গল্প, শুধু মানুষের গল্প শোনানোর ছলে রক্ত-মাংসের একজন এসে হাজির হয়। নামহীন, গোত্রহীন, এক মানুষ।

তার নাম 'সে'।

মানুষের প্রতিনিধি।

তার গায়ে রং চড়ে, কাহিনীর জাল একটু একটু করে এগিয়ে চলে। তার রং, তার কাহিনী সম্পূর্ণ কল্পনার। কল্পনার রঙে 'সে' একবার সাজে বর, একবার কবি, একবার বাঁদর। আরও কত কি। মানুষের প্রতিনিধি 'সে' মাঝে মাঝে এসে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করে। বলে—'আমাকে নিয়ে আজকাল তুমি যা-তা বলছ'।

—অসম্ভব গল্পেরই যে ফর্মাশ।

—হোক না অসম্ভব, তারও তো একটা বাঁধুনি থাকা চাই। এলোমেলো অসম্ভব তো যে-সে বলতে পারে।

একদিন রবীন্দ্রনাথ 'সে'-কে নিয়ে আর এক অবাস্তব গল্প ফেঁদে বসেছেন। নানা ঘটনার বঙ্কুর পথ ধরে এগিয়ে চলে তা। 'সে' কখন মানুষের সম্মান, ইজ্জৎ হারিয়ে বসে ঐ কচি মেয়েটির সামনে, তা জানতে পারে না। পৌরুষও ধুলোয় লুটোয় অজান্তে। পুপে দিদি কাহিনীর ঘনঘটায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে। এতখানি চোখ করে বলে,—সত্যি দাদামশায়।

—সত্যির চেয়ে অনেক বেশি গল্প। দাদামশায় বলেন।

'সে' অসহিষ্ণু হয়, বিরক্ত হয়, অভিমানে লজ্জায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বলে—কী কাণ্ড বাধিয়েছ বলো দেখি।

—কেন কী হল।

আমাকে নিয়ে এ পর্যন্ত বিস্তর আজগুবি গল্প বানিয়েছ। ভাগ্যে আমার নামটা দাও নি, নইলে ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো দায় হত। দেখলুম পুপুদিদির মজা লাগছে, তাই সহ্য করছি সব। কিন্তু এবার যে উল্টো হল।

—কেন কী হল বলোই না।

—তবে শোনো।

পুপুর হাতেই এক নিন্দে ও অপমানের করুণ কাহিনী ব্যক্ত করল সে।

গল্পের কেন্দ্রবিন্দু থেকে একসময় সরে গেল 'সে'।

সরিয়ে দেয়া হল।

আসে অন্য কাহিনী।

খরগোশ, বাঘ, ঘোড়া, হাতি, মাষ্টারমশাই, ঘণ্টাকর্ণদের নিয়ে। তাই নয়, প্রতিবেশী অল্পবয়স্ক সুকুমারও এসে হাজির হয় রাজপুত্রের বেশে।

শুধু লেখায় নয়, রেখা ও রঙে রাঙিয়ে ওঠে এদের মুখ, হাবভাব, অন্তরের কথা। পাতায় পাতায় এরা কথা কয়ে ফিরছে।

শেয়ালের গল্প বলতে বসে দু'টানেই একটি পূর্ণাঙ্গ শেয়াল এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ। এর লেজ রয়েছে। হাত, কান, চোখ, মুখ কিছুই বাদ যায় নি।

গল্পে শেয়ালকে মানুষ গড়তে চেয়েছেন। লেজ তার দিয়েছেন খসিয়ে, গায়ের লোম করা হয়েছে লোপ। দু'পায়ে হাঁটা শেখাতেও ছাড়েন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেজ খোয়ানোর দুঃখে সে কেঁদে ওঠে। বলে—'আমার লেজ কই, আমার লেজ কই'। কয়েক টানে আঁকা এ শেয়ালের রূপ দেখে মোটেই বুঝতে অসুবিধে হয় না যে তার চোখ মুখ থেকে বেদনার আভা ফুটে বেরোচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের হাতে পাল্লারাম গুণ্ডা গোছের মানুষ রূপে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি নিজেই তার বর্ণনা দিয়ে লিখছেন—'মস্ত লম্বা, ঘাড় মোটা, কালো রঙ, ঝাঁকড়া চুল, খোঁচা খোঁচা গোঁফ, চোখ দুটো রাঙা, গায়ে ছিটের মেরজাই, কোমরে লাল রঙের ডোরাকাটা লুঙ্গির উপর হল্‌দে রঙের তিনকোণা গামছা বাঁধা, হাতে পিতলের কাটামারা লম্বা একটা বাঁশের লাঠি।'

সরু, মোটা তুলির টানে পাল্লারাম জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কপালে

কুঞ্চিত রেখা, দু-গালে বয়সের ছাপ, সাদায় কালোয় গোল গোল চোখ। দশাসই চেহারায় মোটা মোটা আঙুলে ধরা লাঠি। সব মিলিয়ে পাল্লারাম এক পালোয়ান।

'সে' বিয়ে করেছে।

তখন ভোর সাড়ে চারটে, রাস্তায় গ্যাস নেবে নি। দেখলুম, নতুন বৌ তার বরকে ধরে নিয়ে চলেছে।

কোথায়।

নতুন বাজারে মানকচু কিনতে।

মানকচু!

হ্যাঁ, বর আপত্তি করেছিল।

কেন।

বলেছিল, অত্যন্ত দরকার হলে বরঞ্চ কাঁঠাল কিনে আনতে পারি, মানকচু পারব না।

তারপরে কী হল?

আনতে হল মানকচু কাঁধে করে।

খুশি হল পুপু। বললে, 'খুব জব্দ।'

শুধু পুপু নয়, বাঙলার ঘরে ঘরে যে সব ন'বছরের পুপুরা জন্মেছে তাদের সকলকে আনন্দ দিতেই রবীন্দ্রনাথ এসব কাহিনীর জাল বুনেছেন। কাহিনীর সঙ্গে ছবি।

'ভোর সাড়ে চারটে, গ্যাস নেবে নি।' তাই চারদিক ছায়া ছায়া অন্ধকার। ফিকে হয়ে আসে ধীরে ধীরে। 'সে' আর তার 'বৌ' চলেছে আবছা অন্ধকারে। অসংখ্য কালো টানের ভিতর সাদা আবছা দুটো মূর্তি বোঝা যায় বেশ।

স্মৃতিরত্নমশায় ও পাঁড়েজীর ছবি অনেক পরিশ্রম ও ধৈর্যের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। অনেক রেখার জটিল আবর্তের দ্বারা সৃষ্টি তাঁরা। স্মৃতিরত্নের টিকি আর পাঁড়েজীর টুপি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বনের পশুদের সঙ্গে ভাগ করার অপরাধে বাঘের, শাস্তি হবে। শাস্তির হুকুম শুনে গা বমি করে এলো। চার হাত পায়ে জোড় করে হাউ হাউ করতে লাগল। এ ছবি ভাষা ছাড়াই যেন কথা কয়ে উঠছে। ছবির অভিব্যক্তি সহজেই হৃদয়স্পর্শী।

রবীন্দ্রনাথের হাতে 'সে' হয়ে উঠেছে অদ্ভুত এক জীব।

এ কী চেহারা তোমার!

চেহারাখানা হারিয়ে ফেলেছি। সে বললে।

হারিয়ে ফেলেছ? মানে কী হল।

এর কোন মানে নেই। মানে কী হল কেউ জানে না। রবীন্দ্রনাথ নিজেও কি জানেন এর অর্থ। না হলে এমন কিম্ভুত চেহারা নিয়ে সে হাজির হবে কেন? সারা দেহ তার আঁকাবাঁকা রেখায় ভরা। মুখেও তাই। মনে হয় দেহ খসে খসে যাচ্ছে। চুল দু'ধারে উঠেছে খাড়া হয়ে। শিল্পীর এ কোন্ খেয়ালের রূপ তা কে বলবে?

এর পর গল্পচ্ছলে রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন জিব-বের-করা কাঁটাওয়ালা রাক্ষস গোছের এক ছবি। থ্যাবড়া মুখে মা-কালীর মতন লম্বা তার জিব। ড্যাবডেবে গোল চোখ। মাথার ছোট বড় কাঁটা সামান্য বেঁকে রয়েছে। যেন এক কল্পজগত থেকে রবীন্দ্রনাথের তুলির ডগায় এসে হাজির হয়েছে।

এই রকম আর একটি বিশ্রী অথচ অদ্ভুত মুখ এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ভাষায় 'অতি অপূর্ব বিশ্রী মুখ। শ্রীমুখটা নিতান্ত মেয়েলি, বিশ্রী মুখেই পুরুষের গৌরব।'

তুলির আঁচড়ে আঁচড়ে মুখের শ্রী চলে গেছে অনেক আগে। ভূতের মত কালো ঘোলাটে চোখ। চোখ দুটো উপর দিকে টানা। দাঁতহীন খোলা মুখে কি এক অব্যক্ত ভাষা।

এমনি করে খেলার ছলে গল্প আর গল্পের ছলে ছবি এঁকে চলেন একের পর এক। বাধাহীন এর গতি। তুলির ডগায় নানান চেহারা

নিয়ে এসে হাজির হয় কত নাম-না-জানা মানুষ, জীব, জন্তু, পাখী, মানুষের মুখ আরো কত কি।

রবীন্দ্রনাথের 'সে' বইখানা পড়ে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) ১৯৩৮ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর ভাগলপুর থেকে একখানা প্রশংসাপূর্ণ সুদীর্ঘ চিঠি কবিকে লেখেন। সেখানা এই প্রসঙ্গে তুলে ধরছি।—

ভাগলপুর

শ্রীচরণেষু, ২৪. ৯. ৩৮

আসবার সময় রাস্তায় আপনার 'সে' আমার সঙ্গী ছিল। এই দুঃসহ গরমেও পথের কষ্ট জানতে দেয় নি। আমাব ধারণা ছিল বইখানি শিশুপাঠ্য। যাদের উদ্দেশ্যে আপনি বইখানা লিখেছেন তাদের শিশুত্ব কোনোকালেই ঘুচবে না। পুপুদিদিকে সামনে বসিয়ে এবং 'সে'-কে উপলক্ষ্য করে আপনি যে সুনিপুণ শরসন্ধান করেছেন তা দেখে সব্যসাচীর কথা মনে পড়ে, উপলব্ধি করি কেন তাঁব শিখণ্ডির প্রয়োজন হয়েছিল। আপনি আমাকে বিছুটি বলছিলেন কিন্তু আপনি নিজে কি কবেছেন। এ যে আতসবাজিব ছদ্মবেশে সঙীন 'শেল'। একটা মোহিনী আলেয়ার পিছু পিছু গিয়ে একেবারে বেত-বনে ঢুকে পড়তে হয়। গা ছ'ড়ে যায়, পায়ে কাঁটা বেঁধে কিন্তু তবু ফিরে আসতে ইচ্ছে করে না। মায়াবিনী আলেয়ার সঞ্চরমান দীপ্তি কাঁটা-বনকেও রমণীয় করে তুলেছে।

...সম্ভব অসম্ভব সব রকম জিনিসের ছতিচ্ছন্ন জ্যোতিতে প্রতি গল্পটি ঝলমল করছে। দুনিয়ার যাবতীয় 'লজি'কে লজ্জিত করে তুলেছেন আপনি। এতদিন এ বইটা পড়ি নি বলে দুঃখ হচ্ছে। আপনার হাত থেকে উপহার পেয়েছি, এই আনন্দে অবশ্য দুঃখটা তত তীব্র হতে পারছে না।

...আমার সভক্তি প্রণাম নিন। প্রণতঃ

(সাহিত্য সংখ্যা দেশ ১৩৮২) বলাই

ছবি আঁকায় নিজের খামখেয়ালীপনা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিচিত্রা' বইয়ে 'ছবি আঁকিয়ে' শীর্ষক কবিতায় সুন্দরভাবে লিখেছেন—

ছেঁড়া খোঁড়া মোর পুরানো খাতায়
ছবি আঁকি আমি যা আসে মাথায়
যখনি ছুটি পাই।
বঙ্কিমমামা বুঝিতে পারে না—
বলে যে, কিছুই যায় না তো চেনা;
বলে কী হয়েছে ছাই।

আমি বলি তারে, এই তো ভালুক,
এই দেখো কালো বাঁদরের মুখ,
এই দেখো লাল ঘোড়া—
রাজপুত্তুর কাল ভোর হলে
দণ্ডকবনে যাবেন যে চলে—
রথে হবে ওরে জোড়া।
উঁচু হয়ে আছে এই যে পাহাড়
খোঁচা খোঁচা গায়ে ওঠে বাঁশ-ঝাড়
হেথা সিংহের বাসা
এঁকে বেঁকে দেখো এই নদী চলে।

নৌকো এঁকেছি ভেসে যায় জলে,
ডাঙা দিয়ে যায় চাষা।
ঘাট থেকে জল এনেছে ঘড়ায়—
শিবঠাকুরের বান্না চড়ায়
তিন কন্যা যে এই।

সাদা কাগজের চর করে ধূ ধূ
সাদা হাঁস দুটো বসে আছে শুধু
কেউ কোথাও নেই।
গোল করে আঁকা এই দেখো দেখি,
সূর্যের ছবি ঠিক হয় নি কি,
মেঘ এই দাগ যত।
শুধু কালী লেপা দেখিছ এ পাতে—
আঁধার হয়েছে এইখানটাতে,
ঠিক সন্ধ্যার মতো।
আমি তো স্পষ্ট দেখি সবকিছু
শালবন দেখো এই উঁচু নিচু
মাছগুলো দেখো জলে।

'ছবি দেখিতে কি পায় সব লোকে—
দোষ আছে তোর মামারই দু'চোখে'
বাবা এই কথা বলে।

* * *

বিভিন্ন সমালোচক রবীন্দ্রনাথের ছবির মধ্যে প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য দেশেব শিল্পীদের আঁকা ছবির ছাপ লক্ষ্য করেছেন এবং সেই দৃষ্টি নিয়ে তাঁবা ববীন্দ্রনাথের ছবির সমালোচনা করেছেন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর ছবিতে কোনো দেশের কোনো বিশেষ শিল্পীর ছাপ পড়ে নি—তা খুঁজতে যাওয়াও বিড়ম্বনা। রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন সম্পূর্ণ খেয়ালের বশে। কাটাকুটির মধ্যে দিয়েই তাঁর তুলির জগতে প্রবেশ। এর পর ছবি আঁকাই তাঁকে নেশার মতো পেয়ে বসে। উজান স্রোতে ভেসে চলা তরীর মত রবীন্দ্রনাথের তুলির গতি চলল কাগজের উপর দিয়ে। বহুজনকে বহু চিঠিতে তিনি এসব কথা উল্লেখ করেন।

তবে রবীন্দ্রনাথ যে প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য দেশের ছবি-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলেন একথাও ঠিক নয়। তাঁর ঝুড়ি ঝুড়ি প্রমাণ পাওয়া যায় শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর সংগ্রহশালায় রক্ষিত পুরোনো নথিপত্র ও বই নাড়াচাড়া করলে। যখন তিনি তাঁর কাব্যসম্পদ নিয়ে সমগ্র পৃথিবী ঘুরছেন, তার অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন দেশের সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করছিলেন। বিশ্বভারতীব সংগ্রহে এমন প্রচুর চিত্র-বিষয়ক বই আছে যে সব রবীন্দ্রনাথ বিদেশ ভ্রমণের সময় সংগ্রহ করেছিলেন। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল নানা দেশে শিল্পের গতি, প্রকৃতি, টেকনিক লক্ষ্য করা।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর।

মাত্র সতের বছর বয়সেই রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই থেকে 'পুণা' জাহাজে প্রথম ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন।

বিলেতে গিয়ে তিনি, ব্রাইটনের একটি স্কুলে ভর্তি হন। পরে লণ্ডনের ইউনিভারসিটি কলেজে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু তিনি শুধু অধ্যয়নের মধ্যেই নিজেকে পুরোপুরি ডুবিয়ে রাখেন নি, তিনি, বৃটিশ মিউজিয়ামে নিয়মিত যেতেন, নানা বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য।

তখন থেকেই ছবি আঁকার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ দেখা যায়। তিনি ছবির গ্যালারীতে বসে বসে ছবিগুলির অঙ্কন-পদ্ধতি পর্যালোচনা করতেন। এই প্রসঙ্গে একদা কলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ এবং রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য শ্রীমুকুল দে লেখেন—"...তিনি একবার আমায় বলেছিলেন যে, ইংরাজ চিত্রকর টার্ণারের ছবিগুলি সেখানে তাঁর সব থেকে বেশী ভাল লেগেছিল। এই নিয়ে পরে তাঁর সঙ্গে আমার অনেক আলোচনা হয়। এমন কি তিনি বলতেন যে, টার্ণারের ছবিতে যেমন নানা সময়ের সূর্যের অপূর্ব,আলোক-রশ্মি দেখা যায় তেমন আর কোথাও তিনি দেখেন নি।" (ভারতবর্ষ, ১৩৪৮, আশ্বিন)

এই কিশোর বয়সে বিলেতের চিত্রশালার চিত্রগুলির সৌন্দর্য তাঁর মনের উপরে এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, এই বিলেত ভ্রমণের ফলেই ছবি আঁকার স্পৃহা তাঁর মধ্যে অঙ্কুরিত হয়। পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথের সেই সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হয়ে বিশ্ববাসীকে বিস্ময়ে বিহ্বল করে।

১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ জাপান ভ্রমণ করেন। সেখানে তিনি জাপানী চিত্রকর হারারের অতিথিরূপে তাঁরই বাসভবনে কিছুদিন থাকেন।· জাপানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে রবীন্দ্রনাথের অন্তরে ছবি আঁকার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা নতুন করে জেগে ওঠে। শিল্পী হারারের সঙ্গে তাঁর মনের ঐকান্তিক মিল স্থাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথ উভয়ের এই মনের মিলকে স্থায়িত্ব দানেব জন্য তাঁর নব-রচিত 'স্ট্রে-বার্ডস' বইখানি চিত্রশিল্পী হারারকে উৎসর্গ করেন। ১৯২৯ সালে চতুর্থবাব রবীন্দ্রনাথ জাপানে যান। সঙ্গে চমক দেয়া বিস্ময় নিয়ে—ছবি।

১৯২৮ থেকে ১৯৩২, শিল্পী রবীন্দ্রনাথেব এটি প্রথম ভাগ। এর পব দ্বিতীয় ভাগ দেখি ১৯৩৪ সাল থেকে।

প্রথমদিকের ছবিতে যেটুকু অপটুতার লক্ষণ দেখা যায়, দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে তার সম্পূর্ণ বিলোপ হয়ে দক্ষতার ছাপ ফুটে ওঠে। সেটা রঙ প্রয়োগের দিকে, বিষয় নির্বাচনের দিকে।

রবীন্দ্রনাথ প্রচুর মুখ ও মুখোশ এঁকেছেন। কিন্তু সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় কোন মুখ বা মুখোশই, দ্বিতীয়বার তাঁর তুলিতে ধরা দেয় নি। মুখ যেমন বিভিন্ন ধরনের এঁকেছেন সেসব মুখে চোখও দিয়েছেন নানা ধরনের। একটি মুখের চোখ অন্য একটি মুখের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। শুধুমাত্র মানুষের বেলাতেই নয়, পাখি ও জন্তু-জানোয়ারদের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

প্রচুর ছবি রবীন্দ্রনাথ পেনেব কালিতে এঁকেছেন। বিশেষতঃ প্রথম দিককার ছবি। এমন পেন ব্যবহার করেছেন যাতে বোঝা

মুশকিল পেন না অন্য কিছু। পেনের মুখে প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন প্রাগৈতিহাসিক যুগের জন্তুরা। অথচ বাস্তবিক তারা কোনকালে এ পৃথিবীতে এসেছে কিনা সন্দেহ।

কিছু ছবি তুলির হাল্কা রঙে আঁকা। একই ছবিতে হাল্কার মাঝে গাঢ় রঙ রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন। অথচ দুটো রঙকে পাশাপাশি রেখেও পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন অদ্ভুতভাবে। যেমন, বধূর মুখের ঘোমটা, আলো-আঁধারের পরিবেশ।

সম্পূর্ণ ছবি জুড়ে গাঢ় রঙ লাগিয়েছেন এমন অনেক আছে। রঙের মধ্যে তিনি লাগান গাঢ় লাল, নীল, কালো ইত্যাদি। আবার এদের মিশ্রিত রঙও এখানে ব্যবহার করেন। একটি ছবিতে নারীর দেহের অবয়ব আঁকতে বসে এত গাঢ় লাল তিনি কেন ব্যবহার করেছেন বোঝা কঠিন। কিন্তু রঙ প্রয়োগের নৈপুণ্যের জন্য ছবি আকর্ষণীয় ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

প্রথম দিকের ছবিতে ড্রয়িং পেনসিলে রবীন্দ্রনাথ রূপ ফোটাতেন। এই ছবিগুলি হাল্কা রঙের। কোথাও গাছের পাতা, রোদে-পোড়া ধূসর প্রান্তর, গাছের নীচে সলজ্জ মুখে কলসি মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা গ্রাম্য বধূ। এমনি আরো অনেক।

রবীন্দ্রনাথ অধিকাংশ ছবিতেই নাম সই করেন নি। অনেক ছবিতে নাম ও তারিখ কোনটাই নেই। এর মধ্যে প্রথম দিককার ছবি লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাতে যেসব ছবিতে নাম সই করেছেন তাতে লিখেছেন 'শ্রীরবীন্দ্র'। পরবর্তীকালে সে নাম সংক্ষিপ্ত হয়ে দাঁড়ায় শুধু 'রবীন্দ্র'।

নিজের বইতে প্রচ্ছদ করার জন্যও রবীন্দ্রনাথ কিছু ছবি আঁকেন। অন্যান্য ছবির মত এখানেও নতুনত্ব ও অভিনবত্ব বিদ্যমান। যেমন—গল্পসল্প, চিত্রলিপি ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ এমন কিছু ছবি এঁকেছেন যার মধ্যে একই সঙ্গে

বিভিন্নরূপে অনুমান করা যায়। যেমন, একটি ছবিতে তিনি গাঢ় কালো রঙ দিয়ে ছুটো ঝাঁপড়া গাছ এঁকেছেন, তার পাশ দিয়ে চলে গেছে হলুদ রঙের মেঠো পথ, দূরে লাল আভা নিয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

ছবির এই যেমন একটি দিক আছে, তেমনি একেই একটু বিশেষভাবে নজর দিলে দেখা যাবে প্রকাণ্ড ঘন কালো এক গাছ মানুষের মুখের আকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার নাক, চোখ, মুখ সবই পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের আঁকা যত ছবি আছে তার মধ্যে মানুষের মুখের ছবি একটি বড় জায়গা অধিকার করে আছে। বিভিন্ন মানুষ, তাদের মুখের বিভিন্ন গড়ন মুখের। মুখের ছবি আঁকা হয়েছে যেমন তুলিতে তেমনি পেনে আবার ড্রয়িং পেনসিলে। প্রত্যেকটা ছবিরই একটা নিজস্বতা আছে। কেউ কারো অনুকরণ নয়, কেউ কারো সমগোত্রীয় নয়, এখানেই রবীন্দ্রনাথের আঁকার বিশেষত্ব।

কোন মুখের ছবিতে ভাসা ভাসা চোখ, কোনটাতে চোখের তারায় বহু কথার একত্র সমাবেশ। এগুলোতে তাদের না-বলা-কথা অব্যক্তভাবে অন্তরে ধ্বনিত হচ্ছে।

কিন্তু অন্যদিকে, কোনো মুখের ভাষা রাখা-ঢাকার বালাই ছেড়ে রেখার বেড়াজাল ছিঁড়ে সরাসরি দর্শকদের কাছে ধরা দিতে ব্যস্ত।

এরকম অনেক আছে।

রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ করবার সময় পাঠকের মনে যেমন এক অনির্বচনীয় ভাব জেগে ওঠে, তাঁর ছবি দেখবার সময়ও তেমনি বিস্ময়ে মন অভিভূত হয়। ছবিতে রঙ লাগান তিনি নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে। রঙ শুধু লাগানোই বড় কথা নয়, বড় কথা— ছবিতে রঙ ব্যবহারের সময় শিল্পীর মানসিক সংযম।

তিনি ছবিতে একটির উপর আর একটি রঙ লাগাতেন। কোন্ রঙটি সত্যিকারের গ্রহণীয়, নানা রঙ ব্যবহার করে তার মধ্য দিয়ে

সেটি খুঁজে বার করতেন। ছবিতে লাগানোর পর অবাঞ্ছিত মনে হলে সেই রঙকে অন্য রঙ দিয়ে ডুবিয়ে দিতেন। এমনি করে পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অনেক নতুন রঙ প্রকাশ পেত—যা ছবিকে নতুনত্ব দান করেছে।

তাঁর ছবিতে একটা বড় বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। তা হোলো, খুব গাঢ় রঙ ছবিতে ব্যবহার করলেও সেই রঙের মধ্য দিয়েই যে কোনো মুখ বা জন্তু-জানোয়ারদের আকার পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। অথচ স্বাভাবিকভাবে এ চিন্তা নতুন করে ভাবিয়ে তোলে।

......"রেখা রঙ নিয়ে এলোমেলো আক কাটলেই ছবি হয় না—তাদের মিলিয়ে নিযে যখন রূপ ফুটে ওঠে তখন সেই রূপ নিত্যতা লাভ করে। ছবি আঁকতে হলে এমন কোনো ভাবকে গ্রহণ করতে হয়, যে ভাবের মধ্যে পূর্ণতাব রস আছে, সেই মূল ভাবেব অনুগত করে রেখা ও রঙের বিন্যাস সাধন করা চাই।"......

কাদম্বিনী দেবীকে (দত্ত) লেখা এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ রেখা ও রঙের সম্বন্ধে যে কথা ব্যাখ্যা করে বলেন, তার মধ্য দিয়ে ছবি আঁকার মূল সত্য ব্যক্ত হয়েছে।

তাই দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথেব আঁকা কোনো ছবিতে অশিক্ষিত বা বালকোচিত তুলির টান একেবারে নেই। প্রায় সব ছবিই যেন পরিণত বুদ্ধি দিয়ে আঁকা।

একদিন খেয়ালের বশে যে তুলি তিনি হাতে তুলে নিয়েছিলেন, সেই তুলি তাঁকে জীবনের শেষ বেলায় নিয়ে গেল অন্য জগতে। এনে দিল বিদেশের দ্বার থেকে জয়ের নতুন মালা।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে এক চিঠিতে ছবি আঁকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজের মনের ভাব নানা উপমার মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করে লেখেন—চিঠির সাহিত্যিক মূল্যও অনস্বীকার্য।

কল্যাণীয়েষু,

অনেকদিন কাটিয়েছি একান্তভাবে কথার সাধনায়, এখন পড়েছি রেখার মায়াজালে জড়িয়ে। কথার দাবী বেশি, কেননা, সে ধনী-ঘরের পাত্রীর মতো অর্থ সঙ্গে করেই আনে, সেই মুখরার মন রাখতে অনেক চিন্তা করতে হয়। রেখা অপ্রগল্‌ভা এবং অর্থহীনা, তার সঙ্গে বিশুদ্ধ লীলা সম্পূর্ণ অনর্থক ব্যবহার। গাছের মাথায় ফুল ফোটানো ফল ধরানো সে এক ব্যাপার, আর গাছের তলায় আলো ছায়ার নাট বসানো সে আর এক কাণ্ড—সেইখানেই ঝিল্লি ডাকে, প্রজাপতি ওড়ে, রাতের বেলা জোনাকি ঝিক্‌মিক্ করে। বনের আসরে এরা সব হাল্কা চালের দল, কোনো দায়িত্ব নেই। আমার রেখার লীলা এই জাতের, যদি সত্যিকার বড়ো আর্টিষ্ট হতুম তাহলে লেখনীর এমন লক্ষ্মীছাড়াগিরি চলত না। এখন আমার মন এই রেখার খেলায় মুক্তি খোঁজে, তখন খুঁজত সিদ্ধি। কথা আমাকে প্রশ্রয় দেয় না। তার কঠিন শাসন-রেখা আমার যথেচ্ছাচারে হাসে, খুব বেশী প্রতিবাদ করে না—তার ফল হয়েছে এখন এই আঁকজোক কাটা ছাড়া আর কিছুতে আমার মন যায় না। কাজকর্ম পড়ে থাকে; চিঠিপত্র হারিয়ে ফেলি, একটু ফাঁক পেলেই ছুটে যাই রেখার অন্দরমহলে। ভিতরে যে দায়িত্ববোধহীন বালকটা লুকিয়ে আছে তার সাহস বেড়ে গিয়েছে।......

ইতি, ১৬ কার্তিক ১৩৩৫

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'চিত্রশিল্পী গুরুদেব'-শীর্ষক স্বল্পদৈর্ঘ্যের প্রবন্ধে শিল্পী নন্দলাল বসু প্রাঞ্জল ভাষায় রবীন্দ্রনাথের ছবির গূঢ়তত্ত্ব বুঝিয়েছেন।

চিত্রশিল্পী গুরুদেব সম্বন্ধে দুটি প্রশ্নের উত্তর এখানে দিয়েছেন। ১। কেন তাঁর ছবির অর্থ বোঝা যায় না ও কেন তাঁর ছবির

নাম দেয়া যায় না। ২। তিনি কি যথার্থ একজন চিত্রশিল্পী হয়েছিলেন?

"রূপশিল্পী জেনে বা না জেনে নানা কলার সাহায্যে প্রকৃতি থেকে পাওয়া বিচিত্র রূপের, বর্ণের ও ছন্দের শিল্প সৃষ্টি করে আনন্দ পাচ্ছেন।

"প্রকৃতি সর্বদাই সৃষ্টি করে কেন—তার কারণ সব সময়ে জানা যায় না; শিল্পীরও সৃষ্টির কারণ সব সময়ে তাঁর কাছে স্পষ্ট নয়। প্রকৃতির মতোই তিনি এসব ভাব, গতি ও ভঙ্গির সাহায্যে কেবল রূপ-সৃষ্টির জন্যেই সৃষ্টি করেন, তাতেই তাঁর আনন্দ।

"কোনো খাঁটি শিল্পসৃষ্টি বোঝাতে যাওয়া বৃথা; শিল্পসৃষ্টি বোঝাবার বা বিশ্লেষণ করবার জিনিস নয়, ওটা অনুভবের জিনিস।

"দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, গুরুদেব ছবি আঁকার জটিল কৌশল ও tradition (ঐতিহ্য) না জেনেও কি করে ছবি আঁকলেন? তবে কি কেবল খেয়াল-খুশির ঝোঁকে যা-তা আঁক-জোক পেড়ে গেছেন? মিছিমিছি তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করেছেন?

"ছবি জিনিসটা মানুষের মনের ভাবের অভিব্যক্তি। সেই ভাব প্রকাশ করার সংকেতের ভাষা জানা প্রত্যেক জীবের স্বভাব-সিদ্ধ। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই, হেসে, কেঁদে, ভঙ্গি করে, শব্দ করে জীব নিজ নিজ মনোভাব প্রকাশ করে থাকে।

গুরুদেব শিল্পী হয়েই এসেছিলেন এবং চিত্রশিল্পী হবার আগেই ভাষা-শিল্পের আঙ্গিকে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন ও জগদ্বিখ্যাত হয়েছিলেন। শিল্পীজনোচিত প্রকাশ-ভঙ্গির প্রাণবত্তা, ছন্দ ও সুষমার স্বাভাবিক জ্ঞান, চিন্তার ঐশ্বর্য ইত্যাদি সম্পদের অধিকারী ছিলেন চিত্রশিল্পী হবার পূর্বেই।

"এইসব কারণে তিনি শিল্পের অতি সামান্য কৌশলের সাহায্যে বহু ও বিচিত্র চিত্র সৃষ্টি করেছেন।"

৯

ছবির প্রদর্শনী ঃ বিদেশে

রবীন্দ্রনাথের ছবি এদেশে তেমন জনপ্রিয়তা লাভ না করলেও ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে তা আলোড়ন তুলেছিল। তাঁর ছবি প্রথম বিদেশেই প্রদর্শনীর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের গোচরে আনা হয় এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করে বলেন, এই ছবির মাধ্যমেই বিদেশের সঙ্গে তাঁর আত্মীক যোগ ঘটে।

১৯৩০ সাল।

রবীন্দ্রনাথ ১৫ দিনের জন্য সোভিয়েট রাশিয়ার মস্কোতে যান। সঙ্গে তাঁর শেষ বয়সের প্রিয়া—ছবি। বিভিন্ন ঢংয়ের বহু ছবি সেখানে প্রদর্শনী করে দেখানো হয়।

এরপর বার্কিংহামে থাকার সময় সেখানেও কবির এক চিত্র প্রদর্শনী হয়। সেই প্রদর্শনীর সভায় শিল্পী রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেন, 'অল্প কিছুদিন হইল আমি ছবি আঁকার মধ্যে একটা আনন্দ অনুভব করিতেছি। ইহার গুণাগুণ সম্বন্ধে আমি অজ্ঞ। ফ্রান্সের

কয়েকজন গুণীর ভরসায় আমি প্রদর্শনীতে সেগুলি লোকচক্ষুর গোচর করিয়াছি। শিশুকাল হইতে শব্দের সহিত আমার পরিচয়, রেখার সহিত নহে।'

যে ছবির জন্য রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সংকোচ ধীরে ধীরে জমে উঠেছিল, সেই ছবিই ইয়োরোপে প্রচুর সমাদর পেয়েছিল। এত সমাদর রবীন্দ্রনাথ কল্পনাতেও আনেন নি।

তাঁর ছবির এক অনুরাগী ভদ্রমহিলা রবীন্দ্রনাথের কিছু বাছাই ছবি প্যারিসে নিয়ে যান সেখানকার ছবিব সমালোচকদের দেখানোর জন্য। ছবিগুলো তাদের দেখাতে একটা ঘরে পর পর সাজানো হল, পাশের ঘরে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। মনের মধ্যে আশা-উৎকণ্ঠার পাহাড়। সকলের সামনে যেতে তাঁর সংকোচ হচ্ছিল।

এমনিভাবে কতক্ষণ কেটে গেল তা কারুর হিসেব নেই। কিন্তু হঠাৎ এরমধ্যে পাশের ঘর থেকে এক ভদ্রলোক ছুটে এসে ববীন্দ্রনাথকে ফরাসী কায়দায় জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন। তারপব আবেগ-ভরা গলায় বললেন—'আমি জানতাম তুমি মহৎ কিন্তু তোমার ছবি না দেখলে আমি কখনও জানতেই পারতাম না যে তুমি কত বড়। এ ছবির প্রদর্শনী হোক আমাদের শিল্পকলায়, এর থেকে শিক্ষণীয় আছে।'

এরপর ঐ ভদ্রলোকই রথচাইল্ড প্রেক্ষাগৃহে রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রদর্শনীর সমস্ত ব্যবস্থা করলেন। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো, আঁদ্রে কারপ্লেস ও কোঁমতেস্ আন্না দ্য নোয়াই এই বকম কয়েকজন শিল্পী ও শিল্পীরসিক মিলে প্যারিসে তাঁর ছবি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এ ব্যাপারে ওকাম্পোর উৎসাহ ও সাহায্যের কথা রবীন্দ্রনাথ বারে বাবে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেন।

প্রখ্যাত স্থাপত্যশিল্পী আর. এস. মিলওয়ার্ড প্যারিসে পিগলী গ্যালারিতে প্রদর্শনী দেখে এসে লিখলেন,—'আমি কি করে বর্ণনা

ফরি, আমি কি দেখলাম? কোনো ছবির নাম নেই—স্বপ্নকে কি নামে বাঁধা যায়? কত আকারেব মুখ, হাত বা শুধু ছুটি চোখের দৃষ্টি অন্ধকারের মধ্যে আমাকে অনুসবণ করে ফেরে।……হয়তো একটি পোট্রেট্—একটি মুখের ভঙ্গিমা, ডিম্বাকৃতি মুখে ঠোঁটের উপর ভেসে যাওয়া হাসি। স্বপ্ন? হ্যাঁ স্বপ্নই বটে। কখনো কোনো ছবির প্রদর্শনী আমাকে ইতিপূর্বে এমন বিচলিত করে নি।'

ড্রেসডেনের আর্ট অ্যাসোসিয়েশন লিখল—'ঠাকুরের ছবি তাঁর কবিতা ও গানের মতই তাঁর আত্মার এক একটি কণা'।

……(৩০শে জুলাই বার্লিন ১৯৩০)

এরপর মিউনিক।

২৩শে জুলাই রবীন্দ্রনাথ মিউনিকের জনসাধারণকে চমৎকৃত কবে দিলেন। ক্যাসপ্রি গ্যালারিতে (Caspri Gallery) তাঁর ছবির প্রদর্শনীর সংবাদ ওখানকার জনসাধারণকে আনন্দ-বিমূঢ় করেছিল।

সাড়ে এগারটায় মিউনিক সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রদর্শনীব উন্মোচন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ শুনতে এসেছিল। শান্ত, সৌম্য, ঋষির ন্যায় ভাবগম্ভীর মূর্তিব মত সকলের সামনে এসে দাঁড়ালেন রবীন্দ্রনাথ। বলে চললেন—'কবিতাকে কখন যথাযথভাবে অনুবাদ করা যায় না। কিন্তু ছবির ভাষা, ভাব অনুবাদের প্রয়োজন নেই। আমার কবিতা রইল আমার দেশবাসীর জন্য আর ছবি পশ্চিমকে উপহার দিলাম।' তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি আবো বলেন—"আমি আমার ছবিকে বিশেষ মূল্যবান মনে করি, কেননা এদের সাহায্যেই পাশ্চাত্য দেশের হৃদয় আমি প্রত্যক্ষ স্পর্শ করতে পেরেছি। বাক্য আমাকে বিফল করেছে, কথা সার্থক হয় নি—দোভাষীর সাহায্যে পরস্পরের মনের ভাব কেবলি বিপর্যস্ত হয়েছে—আশাকরি আমার ছবি পরস্পরকে চিন্তার সমভূমিতে নিয়ে যাবে।"

তারপর একে একে রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা।

সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রদর্শনী হল।

সেখানকার বিশিষ্ট কলাবিশারদরা তাঁর অভূতপূর্ব সৃষ্টি-রহস্যে বিস্মিত হয়ে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে তাঁর স্থান স্বীকার করে নিলেন।

রাশিয়ার একজন আর্টক্রিটিক রবীন্দ্রনাথকে এই সময় কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

প্রশ্ন—আপনি আগে কখনো ছবি এঁকেছেন?

ঃ না।

—আপনার কাজ অনেকটা Vrubel-এর মতো। তাঁর ছবি কি আপনি কখনো দেখেছেন?

ঃ মনে তো হয় না।

—এ কি দান্তের পোট্রেট্?

ঃ না, গত বছর জাপান থেকে ফেরার পথে এঁকেছি, আমার কলম আপন খেয়ালে চলে এই ছবি এঁকে তুলেছে।

—এ কিসের রং?

ঃ কিছুটা না। নীল ফাউণ্টেন পেনের কালি।

—আপনি তেলের ছবি আঁকেন?

ঃ না।

—এটা কি মস্কোর ছবি?

ঃ হবে হয়তো।

ঠিক এর পরদিন ১৭ই সেপ্টেম্বর মস্কোর বৃহত্তম মিউজিয়ামে (State Moscow Museum of Western art.) তাঁর ছবির প্রদর্শনী হল। সেখানে রবীন্দ্রনাথ একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে অভিনন্দিত হলেন—এজন্য কেউ প্রস্তুত ছিলেন না। শিল্পী তাঁর ভাষণে বললেন—'আমার ছবির ভাষা রাশিয়ার মানুষের কাছে সহজে নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছে এজন্য আমি খুব আনন্দিত। আপনাদের প্রশংসা পেয়ে আমার আনন্দের সীমা নেই—কারণ আমি

জানি এদেশের দক্ষ শিল্পী-রসিকরাই আমার ছবির অনুমোদন করলেন। আমার প্রায় অহংকার হচ্ছে। যদিও আমার এ বিদ্যা নতুন বলে আমি তেমন সহজ হতে পারছি না।" এই প্রদর্শনীর সময়কাল ১৭-২৪শে সেপ্টেম্বর।

আর একটি প্রদর্শনীতে তিনি সমালোচকদের নির্দেশ করে খোলামনেই বলেন,—তোমরা যখন আমার ছবি দেখবে তখন আমার কবি পরিচয়টা ভুলে যেও। একজন কবি এই ছবি এঁকেছে ভেবে একটুও মাপ কোরো না, ছেড়ে কথা বোলো না। এরাও তো এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি, কাজেই আমি চাই এরা এদেব আপন যোগ্যতায় যেন নিজের স্থান পায়।"

বার্কিংহামের একজন শিল্পী যিনি ত্রিশ বছর এই কাজ করছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলেন, "এরকম কাজ তিনি করতে পারলে খুসী হতেন।" এছাড়া অনেক আর্টিষ্ট এই কথাই একটু ঘুরিয়ে বলেন,—ঠিক এটাই তাদের লক্ষ্য ছিল।

রাশিয়ার বার্লিন থেকে রবীন্দ্রনাথ শ্রীমতী আশা অধিকারীকে সেখানকার মানুষেব বিভিন্ন রুচি ও গুণের প্রশংসা করে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন। সে চিঠির প্রায় শেষদিকে এক জায়গায় তিনি সেখানে তাঁর চিত্র-প্রদর্শনীর কথা উল্লেখ করে লেখেন—'মস্কো শহরে আমাব ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল। এ ছবিগুলো সৃষ্টিছাড়া সে কথা বলা বাহুল্য। শুধু যে বিদেশী তা নয়, বলা চলে যে তারা কোনো-দেশীই নয়। কিন্তু লোকের ঠেলাঠেলি ভিড়। অল্প কয়দিনে পাঁচ হাজার লোক ছবি দেখেছে। আর যে যা বলুক, অন্ততঃ আমি তো এদের রুচির প্রশংসা না'ক'রে থাকতে পারব না।'

এর পরেই তিনি লিখেছেন—'রুচির কথা ছেড়ে দাও, মনে করা যাক্ এ একটা ফাঁকা কৌতূহল। কিন্তু কৌতূহল থাকাটাই যে জাগ্রত চিত্তের পরিচয়।'

'এখানে ইস্কুলের ছেলেদের আঁকা অনেকগুলি ছবি আমরা পেয়েছি—দেখে বিস্মিত হয়েছি। সেগুলো রীতিমত ছবি, কারো নকল নয়, নিজের উদ্ভাবন। এখানে নির্মাণ এবং দৃষ্টি দুয়েরই প্রতি লক্ষ্য দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছি।'

কিন্তু এসব দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে স্বদেশের দুর্দশার কথা চিন্তা করে তাঁকে আক্ষেপ করতে দেখি। রাশিয়া আর ভারতবর্ষ তাঁর কাছে কত দূব। এ দূরত্ব পথের নয়; মতের, চিন্তাধারার, প্রগতির, বহু সংস্কার ইত্যাদির। রবীন্দ্রনাথ এ চিঠিতেই লিখেছেন—'এখানে এসে অবধি স্বদেশের শিক্ষার কথা অনেক ভাবতে হয়েছে। আমি এক শ্রীনিকেতনে যা করতে চেয়েছি এরা সমগ্র দেশে তাই করছে। আমার নিঃসহায় সামান্য শক্তি নিয়ে কিছু এর আহবণ এবং প্রয়োগ করতে চেষ্টা করব। কিন্তু আর সময় কই—আমার পক্ষে পঞ্চবার্ষিক সংকল্পও হয়তো পূরণ না হতে পারে। প্রায় ত্রিশ বছর কাল যেমন একা একা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লগি ঠেলে কাটিয়েছি আরো দু-চার বছর তেমনি করেই ঠেলতে হবে—বিশেষ এগোবে না, তাও জানি—তবু নালিশ করব না। ......ইতি, ২ অক্টোবর ১৯৩০.

আর একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথ করকে রাশিয়ার ছবির দর্শকদের কথা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রশংসা করে লেখেন—আতলান্তিক মহাসাগরের উপর দিয়ে ব্রেমেন স্টীমারে তখন তিনি ভেসে চলেছেন। লক্ষ্য তাঁর রাশিয়া থেকে আমেরিকার ঘাটে। আকাশে সূর্যের অস্তিত্ব নজরে আসে না। সেই সুযোগে মহাসাগরের জল উত্তাল হয়ে বড় বড় সাপের ফণার মত তাঁদের স্টীমারে এসে ছোবল মারছে। তবু রবীন্দ্রনাথ ভুলতে পারছেন না রাশিয়ার সাধারণ মানুষদের কথা। লিখছেন—'এখানে ছবির ম্যুজিয়মের কাজ কি রকম চলে তার বিবরণ শুনলে নিশ্চয় তোমার ভালো লাগবে। মস্কো শহরে ট্রেটিয়াকভ গ্যালারি (Tretyakov gallery) নামে এক বিখ্যাত চিত্রভাণ্ডার

আছে। সেখানে ১৯২৮ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত এই এক বছরের মধ্যে প্রায় তিন লক্ষ লোক ছবি দেখতে এসেছে। যত দর্শক আসতে চায় তাদের ধরানো শক্ত হয়ে ওঠে। সেইজন্য ছুটির দিনে আগে থাকতে দর্শকের নাম রেজিষ্ট্রি করানো দরকার হয়েছে।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট শাসন প্রবর্তিত হবার পূর্বে যে-সব দর্শক এই রকম গ্যালারিতে আসত তারা ধনী মানী জ্ঞানী দলের লোক এবং তারা, যাদের এরা বলে পরশ্রমজীবী—। কিন্তু এখন আসে অসংখ্য শ্রমজীবীর দল। যথা রাজমিস্ত্রি, লোহার দোকানের মালিক, মুদি, দরজি ইত্যাদি। আর আসে সোভিয়েট সৈনিক, ছাত্র এবং চাষী সম্প্রদায়! আর্টের বোধ এদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে জেগে উঠছে ”

জার্মানী, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশে রবীন্দ্রনাথের ছবি খুব উচ্চ মূল্যেই বিক্রী হয়েছে। ইয়োরোপের কোনো কোনো ব্যক্তি-বিশেষ ও বিভিন্ন যাদুঘর তাঁর ছবি সংগ্রহ ক'রে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করেছে এবং এক একটা ছবির জন্য ৪০০ থেকে ৭০০ ডলার মূল্য দিয়েছে।

১৯৩০ সালে Berlin-এ Galirie Mollerতে রবীন্দ্রচিত্রাবলীর যে প্রদর্শনী হয়, তার পরে সেখানকার বহু পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ছবির আলোচনা হয়। যে পত্রিকাগুলিতে আলোচনা বেরিয়েছিল তার কয়েকটির নাম উল্লেখ করছি—

ম্যুয়েনশেনার টেলিগ্রাম ৎ সাইটুং, ম্যুয়েনশেন (২৩. ৭. ৩০)

হামবুরগার ফ্রেমডেন ব্লাট্ (২৬. ৭. ৩০)

ভসিশে ৎ সাইটুং, বার্লিন্ (১৬. ৭. ৩০)

হানোভারিশার কুরিয়ার (১৯. ৭. ৩)

নাৎনাল টিড্রেণ্ডে (৭. ৪. ৩০) ইত্যাদি।

কয়েকটি মতামতও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

Cuttings from German Papers•

1. 'The abundance of subjects are not less the multiplicity of the technical experiments are surprising. —Muenchener (23. 7. 30)

The dominating black ink lines' devide the coloured washes of colour, which in most cases themselves form decoaetive patterns. Then the oriental, the Indian mystic breaks through with his fantastic birds and strange animals of ledand finely cut in arabes lues and the masks represhting in manifold form tue human face. A note of calm and quiat runs through all these strange creations The figure of a dance in bluc shabings in on a very high intellectual level, and the large head of a woman drawn in large oval spirals in violet tones, suqqets a fine silk. —Hambnrqer Fremdenblatt (29. 7. 30)

These drawings and water colours spring from a fine sense of line, they are given emphasis and unity by the colours and filled with marble colouring, tenderly eusitive and spring in darkling hues. It will be possible to appreciate these abstract, immaterial forms of an ornamental formatism as the real expression of the Indian poot.•

২. 'বিষয়-বস্তু এবং চিত্রকলাব বিভিন্ন আঙ্গিকে পরীক্ষার প্রাচুর্য দেখে আমরা অবাক্ হয়ে যাই।'

• 3. 'Tagore has brought with him a surprise this

time. He paints. He has 300 pictures on exhibition. Pictures of nature of animals flowers and birds……

—'Mannheimer Jageball (22. 7. 30)

৩. 'টাগোর এখানে এসেছেন এক বিস্ময় সঙ্গে নিয়ে। তিনি ছবি আঁকেন। তাঁর আঁকা ৩০০ খানা ছবি নিয়ে চিত্রপ্রদর্শনী খোলা হয়েছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য, জন্তুজানোয়ার, ফুল, পাখী প্রভৃতির ছবি।

১৯৩০ সালে ফরাসী দেশের পিগেল গ্যালারীতে রবীন্দ্র চিত্রকলার যে প্রদর্শনী হয়েছিল, সেই উপলক্ষ্যে ফরাসী দেশে রবীন্দ্রনাথের চিত্র সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়। সে সময় মসিয়েঁ হেনরী বিছু নামে একজন চিত্র-সমালোচক খবরের কাগজে একটা দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশ করেন। তার কিছু উদ্ধৃত করছি—

'This work is not a holly or a plaything. For the last two years, Rabindranath Tagore has been wholly occupied by this new form or creation.

A talent genius was asleep, that is made plain by the sureness of the design, the beauty of the tones, the liveliness of every detail, the sense of ornament"

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মোট ১২টি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। পাঠকের সুবিধার্থে নিম্নে তাদের পরিসংখ্যান দেয়া হ'ল।

1. Galirie Pigalle, Paris (১২৫ ছবি)

: ২রা মে থেকে ১৯ই মে ১৯৩০

2. India Society-র ব্যবস্থাপনায়
British Indian Rooms, London.

: ৪ঠা জুন ১৯৩০

3. Birmingham art Gallery

: ২রা জুন থেকে ১৮ই জুন ১৯৩০

4. Galirie Moller, Berlin

: ১৬ই জুলাই থেকে ৩০শে জুলাই ১৯৩০

5. State art Gallery, Dresden

: ১৯শে জুল:ই থেকে ২৩শে জুলাই ১৯৩০

6. Gallery Caspari, Munic

: ২৩শে জুলাই থেকে ৩০শে জুলাই ১৯৩০

7. Cherlottenberg Picture Gallery, Copanham, Denmark

: ৯ই আগষ্ট থেকে ২৪শে আগষ্ট ১৯৩০

8. State Moscow Museum of Western art, Moscow

: ১৭ই সেপ্টেম্বব থেকে ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৩০

9. Messrs Doll Richards, Boston

: ২১শে অক্টোবব থেকে ২০শে নভেম্বব ১৯৩০

10. Museum of Fine Arts, Boston

: ২১শে অক্টোবর থেকে ২০শে নভেম্বর ১৯৩০

11. The Fifty Sixth Street Galleries New York

: ১৫ই নভেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বর ১৯৩০

12. The Newman Galleries, Filadelfia

: ১লা মে থেকে ৮ই মে ১৯৩১

কবির মৃত্যুর পর ১৯৪৬ সালে Paris-এ Unesco-এর উদ্যোগে Modern Arts exhibition-এ তাঁর ৪ খানি চিত্র প্রদর্শিত হয়।

* * *

কল্যাণীয়েষু,

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলুম। আছি দক্ষিণ ফ্রান্সে……সময়ের একটু ফাঁক পেলে ছবিও আঁকি, তবু সেটার সঙ্গে কিশলয় উদ্গমের সুরে মিল আছে। এখানে একজন জার্মান সস্ত্রীক আছেন—। আমার ছবিগুলো দেখে অত্যন্ত উত্তেজিত—বলেন, বার্লিনে এগুলো দেখানো চাই-ই—absolutely, আশা হচ্ছে এগুলো রসিকদের দৃষ্টিগোচর হবে। পণ করেছি 'আমার জন্মভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাব না—অযোগ্য অভাজনদের স্থূল হস্তাবলেপ অসহ্য হয়ে এসেছে।……

ইতি, ১ এপ্রিল ১৯৩০
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা এই চিঠির মধ্যে একদিকে আনন্দ অন্যদিকে আক্ষেপ, একদিকে আশা অন্যদিকে হতাশাময় মনের প্রকাশ এখানে রবীন্দ্রনাথ করেছেন। ইয়োরোপ যখন রবীন্দ্রনাথের ছবির জন্য উচ্চকণ্ঠে প্রশংসার সঙ্গে হাসিমুখে জয়ের মালা নিয়ে এগিয়ে আসে ঠিক তখনই এদেশ অবহেলায়, অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। স্বদেশ তাই দূরে সরে আপনজন হয়ে ওঠে ইয়োরোপ। অন্তরের এ ক্ষোভ, এ দুঃখ রবীন্দ্রনাথ সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে ব্যক্ত করলেন উপরের চিঠিতে।

ফরাসী শিল্পীদের অনুরোধে ১৯৩০ এর ২রা মে প্যারিসের 'তে আতর পিগলি' গ্যালারিতে রবীন্দ্রনাথের ১২৫ খানা ছবির প্রদর্শনী হয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো এবং কঁতেস দ্য নোয়ালিস। এই প্রদর্শনী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,—'ফ্রান্সের মত কড়া হাকিমের দরবারেও শিরোপা মিলেছে—কিছুমাত্র কার্পণ্য করে নি'।

এই প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা আর একটি চিঠি উল্লেখযোগ্য।

ওঁ

C/o- American Exp Co.,
6. Haymarket,
London.

কল্যাণীয়েষু,

প্যারিসে আমার চিত্রকীর্তি স্বদেশে শ্রুতকীর্তিরূপে হয়তো এতদিনে পৌঁছেছে। উপস্থিত থাকলে খুশি হতে।

এদেশেও লণ্ডন, বার্কিংহাম প্রভৃতি জায়গায় এক্জিবিশন হবে। সমজদার যারা মফস্বলে তারা ভালোই বলছে। অতএব এবারে দেশে ফিরলে হয়তো একটা অভিনন্দন পত্র ও ফুলের মালা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু একটা ছবিও দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারব না।······

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিদেশে একটার পর একটা প্রদর্শনী হয় আর সঙ্গে সঙ্গে সে দেশের সংবাদপত্রগুলি আলোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। ১৬ই জুলাই ১৯৩০, বার্লিনের এক সংবাদপত্র 'Vossische Zeitung' লিখল—

Rabindranath Tagore as a Painter—
Exhilition in the Gallerie Moeller.

"I was different when I went there,—and prepared to experience a very curious surprise. We admire the Indian poet-philosopher from whom emanate warm rays of a mild and deep wisdom.

........These drawings and paintings in water-colour give proof of a quite original, quite ingenous gift to seize the picture-like plays of imagination and to give them obvious form.

Most remarkable is how this way of Tagore's to look behind the objects of world meets with European and espacially with German artists of our days."

* * *

Rabindranath Tagore's Paintings and Drawings

"I found work of a very independent and free spirit full of colour strength, a natural vision, deceivingly lively fabulous animals with general resenblance of real forms and I found that he gives proof of a most rare tests of colours by his supreme way of mixing and harmoinzing his inks........His ink mixtures are anazingly sensitive. ....he attains a level of art that now-a-days is quite extraordinary. And the men of Birmingham were right to advise him to show his pictures in Germany.

—Berliner Boersenzeitung, Berlin.

* * *

"Tagore has brought with him a surprise this time. He paints. He has 300 Pictures on exhibition. Pictures of nature, of animals, flowers and bird. Strange animals of legend, rare-birds, angular (Jagged) forms. Madonus set in shining backgrounds. Dreamy formatism. All is full of rhythm and inner melody. Tagore shows an amazing taste in colour." —Maunheimer Tageblatt (22. 7. 30)

There is something unrestrained in all these strange pictures. A dancing figure in blue shades shows a high spiritual quality. This exhibition is a sensation for the sceptics, who belive that old age excluds vitality and Vigour of mind.

—Muenchener Telegramm—Zeitung, Muenchen.

* * *

........Tagore's pictures are full of rhythm but also of melody and though Tagore is an autodidact, astonishingly show mastery of colour and form. But what gives the ajuarelles their exotic peculiarity are the special attractive animal pictures facinating amalgamation of landscape with that what makes them alive. —Berliner Morgenzeitung (24. 7. 1930.)

* * *

For Tagore painting represents a new medium of artistic expression aud he makes use of it ingenuonsly to seize his poetical visions.

—Dresdcner Anzeiger, Dresden.

* * *

........The peculiarity in the case of Tagore's in the late surprising out break of his sense for painting........ —Vorwacrts, Berlin.(21. 7. 30)

* * *

........It is hardly known to the world that the great Indian Poet is also a master of colour and line.

May the world convince itself of his work. There is no question about style, painting to Tagore is a new means of expression, which he uses unprijudiced and naively to hold poetical visions........

—Dresdener Auzeiger, Dresden (19 7. 30).

* * *

এই সময় ববীন্দ্রনাথেব কিছু ছবি বার্লিনের 'National Gallery'-তে রাখবার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে ছবি চেয়ে যে অনুরোধ করা হয় সেই উত্তবে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন তা তুলে দেওয়া গেল—

To

Geheimrat Justi

Berlin, August 16th 1930.

Honourable Sir,

I understand from Herr Moeller that you would like to acquire for the collection of drawings in the National Gallery some of my works which have been exhibited in the gallery during my visit to Berlin.

I have great pleasure in offering as a gift to the German Nation from which I have received such generous hospitality and for which I have such profound and sincere regard.

Believe me, dear Sir,
yours very sincerely,
RABINDRANATH TAGORE.

Press Cutting

New York Times

Tagore will sell paintings for fund

Dated 27 Oct. 1930.

New Heaven, Conn. Oct. 26—Sir Rabindranath Tagore, Indian Poet, philosopher and humanitarian, left here to-day for Philadelphia where he will remain for several days trying to sell his paintings to further his work in India, where he is trying to develop the school, he founded.

*   *   *

from :—

Herald Tribune

New York City

20. 11. 30

Tagore Reads own Poems

At Exhibition of his Art,

75 Water Colours Among Paintings

On Display Here

Rabindranath Tagore, the Indian Poet and philosopher, took part at the opening of an exhibition of his paintings yesterday at the Fifty-sixth Street Galleries, 6 East Fifty-sixth street several hundred invited guests were present for the private view which was marked by the reading by Tagore of several of his poems........

Brooklyn Daily Eagle

23. 11. 30.

Tagore Exhibition

........With the exhibition of his paintings at the 56th street Galleries Rabindranath Tagore, the famous Indian Poet and philosopher, educationer and economist, reveals a completely new side of his nature that of the imaginative artist who depicts scenes of native life, familior characters and objects according to his individual conception of them.

Five of the Poet's paintings have been acquired by the Berlin National Gallery and the 150 to be exhibited.

*　　　*　　　*

International Press Council Bureau,

51, Red Lion Street, London. W. C. I.

Extract from

Piorneer

Allahabad

Indian Exhibition

in London.

Dr. Tagore's Paintings

6. 12. 30.

An exhibition of 'Charka' work by the pupil of the Sabarmati Ashram and the paintings and drawings of Dr. Rabindranath Tagore and his pupils

at Santiniketan has been opened at the Friend's House, London.

* * *

New York—America

Tagore's Drawings

Dec. 7. 30.

At the Fifty-sixth Street Galleries, four exhibitions are current drawings by Tagore, sculptures by Count Harrach drawings by Margaret S. Hinchman and paintings by Albert John comas.

Rabindranath Tagore's drawings have raised inter national controversy. The reason is doubtless, that they are both mystical and original which is to say their mysticism does not rely for expression on orthodox symbology.

১০

প্রদর্শনী ঃ স্বদেশে

স্বদেশে রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রদর্শনী প্রথম হয় কলকাতায় 'Government School of Arts' এ। এখানে মুকুল দে'র তত্ত্বাবধানে ২৬৫ খানা ছবি নিয়ে প্রদর্শনী সুরু হয়। প্রদর্শনীর প্রত্যেকটি ছবিতে নাম দেন মুকুল দে। আর সেসব ছবির তখনকাব মূল্য নির্ধারণ করেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯৩২ সাল।

সময়টা ২০ থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারী। রবীন্দ্রনাথের এই চিত্র প্রদর্শনী উপলক্ষে ইংরেজীতে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয় সংখ্যাটিতে ছবির নাম ও সঙ্গে দাম উল্লেখ ছিল।

এতে 'Forword' শীর্ষক প্রবন্ধে শিল্পী মুকুল দে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি জীবন তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও সেইসঙ্গে শিল্পীজীবন নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। তিনি এখানে লেখেন—যখন ভারতবর্ষে খবর এলো যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি প্যারিসে প্রদর্শনীর মাধ্যমে

দেখানো হয়েছে, তখন এদেশের বহু মানুষের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। কিন্তু ছবি আঁকিয়ে তিনি হঠাৎ হন নি। তাঁর চারপাশে যে জগৎ তাতে তাঁর অন্তরের মধ্যে আপনা থেকেই এক প্রেরণার বীজ বপন করা হয়ে গিয়েছিল। ১৬ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে যান এবং সেখানে টারনার ও অন্যান্য ইয়োরোপীয়ান শিল্পীদের কাজ তাঁর মন জয় করে।

১৯০৭ সালে মুকুল দে যখন শান্তিনিকেতনের ছাত্র তখন তিনি রবীন্দ্রনাথের ভিতর শিল্পীসত্তা লক্ষ্য করেন। কবি তাঁকে কালো চামড়ায় বাঁধানো একটি সুদৃশ্য ড্রয়িং বুক উপহার দেন। তাতে তিনি এঁকেছিলেন মানুষের মুখ, দেহ, প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনা। প্রায় সবগুলিই পেনসিল ও পেনের কালিতে আঁকা। আর কিছু আঁকা ড্রয়িং পেনসিলে। এতে আঁকা আছে তাঁর স্ত্রীর মুখও।

১৯১৩ সালে মুকুল দে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলমোড়ার কাছে রামগড় পাহাড়ে যান। মুকুল দে যখন আঁকায় মগ্ন থাকতেন রবীন্দ্রনাথ তাঁরই পাশে মৌন হয়ে বসে দেখে যেতেন। একদিন সকালে মুকুলের স্কেচ্-বইতে তিনি পরপর কয়েকটি ছবি আঁকলেন। তাঁর মধ্যে একটি প্রতিমা দেবীর ছবি।

১৯১৫ সালে নন্দলাল, মুকুল ও সুরেনকে নিয়ে যান তিনি শিলাইদহে। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য নিজের চোখে দেখবার জন্য।

তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে ছবি সম্বন্ধে আগ্রহ, উৎসাহ এত প্রকট হয়ে উঠেছিল যে, তিনি ভারতীয় বিভিন্ন ধরণের ছবি সংগ্রহ করতে থাকেন। ছবি সম্বন্ধে বইও তিনি সংগ্রহ করেন। ১৯১৬ সালে তিনি জাপান যান। সেখানে বিখ্যাত শিল্পী ওকোয়ামা টাইকানের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর ছবি লক্ষ্য করেন। ওখান থেকে ফিরে শান্তিনিকেতনে একটি আর্ট স্কুল স্থাপনের কথা চিন্তা করেন।

তিনি শুধু জাপান নয়, চীন ও ইয়োরোপের বহু শিল্পীর অঙ্কন

পদ্ধতি, তাদের ষ্টাইল ভালোভাবে দেখেন। কবি হওয়ার মতো শিল্পী হওয়ার পিছনেও এমনি অনেক ইতিহাস আছে।

১৯৩১ সালে রবীন্দ্রনাথ কালার চক্, প্যাস্টেলে ছবি আঁকতে থাকেন।

এই প্রসঙ্গে অতি উৎসাহী পাঠক এবং ভবিষ্যৎ কালের গবেষকদের কথা চিন্তা করে এদেশে রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিত্র প্রদর্শনীর প্রদর্শিত ছবিগুলির নাম (মুকুল দে'র দেওয়া) ও দাম (রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত) লিপিবদ্ধ করছি। যদিও এ লিস্ট কিছুটা দীর্ঘ তবু সেদিন প্রদর্শিত ছবি সম্বন্ধে সামান্য ধারণা পাঠকেরা করতে পারবেন।

IN GOVT. ART SCHOOL

Calcutta

LIST OF EXHIBITS

		Rs.
1.	The opening of a Bud	1,250
2.	A Head study in Blue, Black & Red	300
3.	A Muhammedan Nobleman	300
4.	To the Sea	650
5.	Idol	500
6.	Infuriated Viswamitra	750
7.	The Dragon	300
8.	Rescuring the Victim	1,000
9.	A Lady on the Terrace	350
10.	Waiting under the tree	450
11.	The Devont and the Devotee	450
12	Flower offerings	500

No.	Title	Rs.
13.	Landscape	550
14.	Head Study—Black and Blue	450
15.	Head Study—Calmness	550
16.	The thinker	650
17.	The Stormy Petrel	600
18.	Beast from Fable Land	750
19.	Charenda Parenda—Mythical Beings	600
20.	In the Pool	300
21,	Landscape—Stormy Night	300
22.	Design for Tapestry	500
23.	The Poet's Abode	300
24.	The Watch Dog	350
25.	Possession	350
26.	A Japanese Girl	225
27.	The Witch	305
28.	Decorative design	150
29.	Call of the Watch	450
30.	The Exhausted Pilgrims	500
31.	Afloat	275
32.	Head Study—A Sketch for wooden Sculpture	250
33.	Radhika	450
34.	The Cock	150
35.	The Golden Shower	150
36.	The Onlooker	425

No.	Title	Rs.
37.	The Fawn	350
38.	Landscape	275
39.	Study of a Bird	275
40.	A Flower	130
41.	Siva in Kailase	200
42.	Landscape	300
43.	The Woodland Sprite	225
44.	Meditation	350
45.	The offering	435
46.	The Judge	450
47.	Elokeshi—The Woman with the Dishevetted Hair	130
48.	The Vision	450
49.	The Sphinx	550
50.	The Devil	220
51.	Grim Determination	750
52.	Natir Puja—The Last Dance	225
53.	Mother and Child	150
54.	The Wedded Paid	450
55.	The Welcome	485
56.	The Smiling Girl	225
57.	Study of a Head	550
58.	A Cottage	150
59.	The Design	175
60.	Ecstasy	275

No.	Title	Rs.
61.	Expostulation	175
62.	Study of a Head—Black and Grey	300
63.	Maharaja Vikramaditya	375
64.	Decorated Poem	450
65.	A Buddhist Bhikshu	205
66.	The Dancers	350
67.	The Top	50
68.	Neru—The Baldhead	150
69.	Camping at the Foot of the Himalays	275
70.	The Appeal	375
71	Rushing onward	175
72.	Sita Kundu—The Sacred well	500
73.	Peeping through the Cave	150
74.	Depressed	515
75.	Tapati	285
76.	Baba Mustafa (Ali Baba and the forty Thieves)	250
77.	United	250
78.	The Image	150
79.	Narkeldanga (30 copies) each	75
80.	The Chaprasi	175
81.	The Captive	200
82	Beseeching	350
83.	An Aborigine	185
84.	The Village Maid	175

		Rs.
85.	A Lady of High Degree	250
86.	Andrews and Myself	175
87.	Ending His life	120
88.	The Robber Chief	180
89.	Blessing	135
90	A Hermit	125
91.	'Watching the Victim	225
92	Unbearable	185
93.	Waiting	205
94.	The Dance	200
95.	The Wandering Damayanti	305
96.	Secret Meeting	150
97.	Animal from the Fable Land	125
98.	Flowers	195
99.	Ray of Hope	350
100.	The Helper	125
101.	The Immovable	250
102.	The Temple	225
103.	Design for Book Cover	150
104.	The Duck	250
105.	Fearless	300
106.	Grip of Love	250
107.	In Quest of the Beloved	280
108.	On a Rocky Shore	100
109.	Through the Ordeal	150

		Rs.
110.	Wild Duck	300
111.	Grand mother's Chair	150
112	Design for a Flask	125
113.	The Boy (30 copies) each	60
114.	Waiting for the Dawn	315
115.	Barred	175
116.	The Door keeper	130
117.	The Morning Light	80
118	Radha as Milkmaid	250
119.	Pilgrims	175
120.	The Weird Smile	250
121.	The Molla	205
122	Cottage by Night	300
123.	Self Portrait	250
124.	The Toilet	125
125	Amita	25
126.	The Plantain Tree	175
127.	Illustrated Poem	208
128.	A Manipuri Girl	325
129.	Startled	150
130	Abu Hossain	225
131	Kala-Bau	350
132.	Jatadhar	220
133.	The Broad Smile	100
134.	Shuo Rani the Favourite Queen and Duo Rani the Neglected Queen	200

		Rs.
135.	Study of a Head	175
136.	Landscape	110
137.	To the Temple	65
138.	Defiance	135
139.	The Wood Pigeon	95
140.	Running Away	95
141.	Design for Book cover	50
142.	From behind Purdah	125
143.	Morning	85
144.	Pallaram's Uncle Illustrated of a Story	175
145.	The Torch Bearer	175
146	He—character from a Story	—
147.	Landscape	120
148	Fallen	130
149.	The Wise Man	215
150	Flowers	105
151.	The Dark Boy	145
152.	Dante	400
153.	The Young Fawn in the Dark Night	275
154.	The Brooding Duck	110
155.	Watching the Advent of Dawn in the cave	95
156.	Kacha and Devajani	100
157.	The Monster	105
158.	The Broken Hope	200

		Rs.
159.	The Welcome	275
160.	Despair	150
161.	Corner of Garden	125
162.	The Stone Cover	65
163.	The Pore	215
164.	Flying through the Air on the Back of crane	220
165	Arguing It out	195
166.	Study of a Head	105
167.	The Dancer	65
158.	Study of a Head	135
169.	The Consoler	350
170	Twilight	175
171.	Thrushing with a Pole	160
172.	Through the wood	300
173.	Character for a Japanese Play	120
174.	Head Study	85
175.	Landscape, Santiniketan	150
176.	Design for a Pottery Vessel	175
177.	The Darshan	135
178.	The Veteran	158
179.	The Mask	180
180.	The Camel Riders	225
181.	The Abode of God	300
182.	Young Prince and Princess	450

		Rs.
183.	Radhik's Toillet	300
184.	Curoisity	450
185.	A Field of Ripe corn	130
186.	An Indotherium	150
187.	The Confession	250
188.	The Storm	175
189.	Study of Head in Cubist Style	480
190.	A Design for Pottery	175
191.	She has committed Suicide !	500
192.	Ahalya Turned into Stone	350
193.	The Japanese Maid	85
194.	An Aborigine	95
195.	Mask	185
196.	In the Quest	155
197.	Onword	98
198.	The Jailer	105
199.	A Study of a Head, a French Gentleman	200
200.	The Dried Soul	250
201.	The King and the Queen	350
202	Golden Dream	350
203.	In the Moon Light	250
204.	At the Height of Suffering	300
205.	On the way to the Lover	225
206.	Go Back !	150
207.	The old Woman	185

		Rs.
208.	The Pierced Heart	350
209.	Through the ordeal of Life	375
210.	The Apparition	285
211.	The Rest	75
212.	Awakening	95
213.	Lovers in the Moon light	300
214.	Sita in the Forest	250
215.	Study of a Character	190
216.	An Amir in Flowing Robes	300
217.	Marching with Confidence	200
218.	Her Sole Support of Life	85
219.	The Mask	250
220.	Sham Sundari—Character from Jagaraj	235
221.	By the Lake in Moon light	235
222.	A Study in Cubism	227
223.	A Landscape	275
224.	The Spirit yf Fire	275
225.	Naga-Nagini—The Snake King Courting the Serpent Maid	250
226.	Avisarika	175
227.	The Blind King Dhritarashtra	250
228.	Study of a Canna	85
229.	Byangama—a Fabulous Bird	200
230.	Design for Lacquered Ware	250
231	Man and the Beast	275

No.	Title	Rs.
232.	Pallaram, a Durwan-from 'Se'	300
233.	In the Grim Grip	250
234.	The Milkmaid	295
235.	Decorative Design of Bird and Flower	175
236.	Day and Night	215
237.	Prehistoric Retile—Fish and Bird Combined	225
238.	Prayer	280
239.	The Unwilling Bride	350
240.	By the Side of the Funeral Pyre	210
241.	The Last Gasp	350
242.	Behind the Curtain	185
243	Flowers	300
244.	Flower Study	285
245.	The Sacred Bull	250
246.	Rores	500
247.	The Judge	750
248.	Lady with a Green Cap	550
249.	Animal from the Fable Land	575
250.	The Dying Breath	600
251.	My All in All	700
252.	The Bird King,	750
253.	Jatayu (The Great Bird in Ramayana)	750
254.	Overwhelmed with thought	450
255.	Awaiting for his Arrival	750

		Rs.
256.	Temple By Night	400
257.	Adrift (Dry-point etching) all signed proof, 30 Copies, each	100
258.	The Acceptance—Bride and Bridegroom	465
259.	Mother and Child	500
260.	Main—Puttike—The Puppet	125
261.	The Veiled Lady	200
262.	Ruined Buddhist Monastery	800
263	A Port folio in calf with Animal (Design painted on leather by the poet)	50
264.	Painting on the leather by the Poet	100
265.	A Terra-Cotta Vase designed and painted by the Poet *	—

উল্লিখিত ছবিগুলিতে মুকুল দে নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে তাঁকে সম্মতি দেন নি। কেননা ছবিতে নাম দিতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। শোনা যায়, এর সঙ্গে আরো অন্যান্য কারণে মুকুল দে'কে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে তিক্ততা সুরু হয়। যার ফলে পরবর্তীকালে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক অনেক শিথিল হয়ে আসে।

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে স্বদেশে তাঁর ছবির আর কোনো প্রদর্শনী হয় নি। তাঁর মৃত্যুর পর কলকাতা ও বোম্বাইয়ে প্রদর্শনী হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের ছবির যে প্রদর্শনী হয়েছিল সে সম্পর্কে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা

---

*Rabindranath's first and only Potery work (done on February 1. 1932).

হয়। সংখ্যাটি বিশ্বভারতীর কলাভবনে রাখা আছে এর থেকে কিছু অংশ তুলে ধরা গেল—

Exhibition of Paintings & Drawings

By

Rabindranath Tagore

Rabindra Parishad : University of Calcutta

March, 1947

Ashutosh Building

এই ম্যাগাজিনের ভিতর শুরুতেই আছে—

হে সুন্দর, খোল তব নন্দনের দ্বার,
মর্ত্যের নয়নে আনো মূর্তি অমরার।
অরূপ করুক লীলা রূপের লেখায়
দেখাও চিত্তের নৃত্য রেখায় রেখায়। —রবীন্দ্রনাথ

এরপর 'My Pictures' এই শিরোনামায় রবীন্দ্রনাথ নিজের ছবি সম্বন্ধে নিজে যা মন্তব্য করেছেন তা ছাপা হয়েছে। এখানে তিনি যা মতামত ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্র-চিত্রানুরাগী মাত্রেই তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

—My Pictures—

......"I, as an artist, can not claim any merit for my courage, for it is the unconscious courage of the unsophisticated, like that of one who walks in dream on perilous path, who is saved only because he is blind to the risk.

The only training which I had from my young days was the training in rhythms the rhythm in thought, the rhythm in sound.

……When the scratches in my manuscript cried, like sinners, for salvation, and assailed my eyes with ugliness of their irrelevance, I often took more time in rescuing them into a merciful finality of rhythm than in carring on what was my obvious task.

In the process of this salvage work I came to discover one fact, that in the universe of forms there is a perpetual activity of natural selection in lines, and only the fittest survives which has in itself the fitness of cadence, and I felt that to solve the unemployment problem of the homeless heterogeneous into an interrelated balance of fulfilment is created itself"

এখানে নিজের ছবি সম্বন্ধে লিখতে বসে রবীন্দ্রনাথ এই লেখার মধ্যেই স্থানে স্থানে নানা কাটাকুটির ভিতর দিয়ে অনেক নাম-না-জানা ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন।

এই রকম, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

অঘ্রানের প্রবাসীর জন্য আমার কবিতার একটি কাটাকুটি চিত্রিত পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছি। তার সঙ্গে যদিও পূর্বপ্রকাশিত কোনো কবিতার সম্পর্ক আছে তবুও তাকে নূতন বলেই গণ্য করা উচিত।……

ইতি ১৯ আশ্বিন ১৩৪৩

আপনাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ নূতনত্ব তাঁর লেখার জন্য নয়। তাঁর অঙ্কন-প্রতিভা প্রকাশের জন্যই।

সম্ভবতঃ উত্তরাধিকার সূত্রেই কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা শিল্প-প্রতিভা লক্ষ্য করি। তিনিও অনেক ছবি এঁকেছেন। এর কয়েকখানি রবীন্দ্রভারতীতে আছে। রথীন্দ্রনাথের স্ত্রী শ্রীমতী প্রতিমা দেবীও ভালো ছবি আঁকতে পারতেন। তাঁর ছবির মধ্যে নৈপুণ্যের সঙ্গে নতুনত্ব প্রকাশ পেত। সমুদ্রে মাছ ধরার উপর একটি বিরাট ছবি তিনি হাল্কা রঙের সাহায্যে নিঁখুতভাবে এঁকেছেন। ছবিটি রবীন্দ্রভারতীতে রাখা আছে।

'রবীন্দ্রনাথের আগে ও পরে সাহিত্যিক হয়ে ছবি এঁকেছেন এমন কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়। যেমন, রাশিয়ার টলষ্টয়, ইংলণ্ডের মিসেস ব্রোনটি, এদেশের শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর প্রমুখ ব্যক্তি।

রবীন্দ্রনাথের মত তারাশঙ্কর শেষের কয়েকবছর ধরে ছবি আঁকছিলেন। তার মধ্যে রঙিন ছবির সংখ্যাই বেশী। অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে তারাশঙ্করের ছবির প্রদর্শনী কয়েকবছর আগে করা হয়েছিল।

বাংলা-সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক শরৎচন্দ্রও ছবি আঁকতেন। নিজের ছবি আঁকার কথা উল্লেখ করে বার্মা থেকে এক চিঠিতে তিনি প্রমথ ভট্টাচার্যকে লিখছেন—আমিও ছবি আঁকি। তাই ছবির আমিও কিছু বুঝি। এ নিয়ে নেহাত কম বই পড়ি নি।'

এইরকম কিছু প্রতিভার সমন্বয় হয়তো অনেকের থাকতে পারে এবং থাকা তত বিস্ময়কর নয়, যত বিস্ময়কর ৭০ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের নতুনভাবে নতুনপথে নিজেকে প্রকাশ করা।

একদিন লেখার ঝাঁপি বন্ধ করে রং তুলিতে হাত দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তারপর থেকে দীপ্তিমান সূর্য একটু একটু করে পশ্চিম দিগন্তে ম্লান হয়ে ঢলে পড়ছিল। এমনি এক দৈহিক অবস্থায় যখন ছবি আঁকাও অসম্ভব, হাতেধরা তুলি কাঁপে, রবীন্দ্রনাথ ফেলে আসা দিনগুলিকে কাছে ডেকে এনে স্মরণ করেন,—"ছবি নিয়ে যখন মেতে

ছিলুম তখন নতুন নতুন রাগ রং নিয়ে খেলে দিন গেছে। এখনো পৃথিবী তেমনি সুন্দর, তেমনি শোভাময় আছে, সমান সন্ধ্যা রাত্রি ছবির শেষ নেই, কিন্তু মনের দর্পণে মরচে পড়ে গেছে, দেহটা হয়েছে অপটু, সবদিক দিয়ে কর্মই যেন হল শেষ। শুধু ছবি দেখা টুকুই বাকি।"......

জীবনের একেবারে শেষ দিকে লেখা এই আক্ষেপ। লিখতে গিয়ে হাত কেঁপেছে। লেখার স্বাভাবিক রূপ তাই গিয়েছে মনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। ইচ্ছেমত আকার নিয়ে তারা এঁকে বেঁকে দাঁড়িয়েছে।

নিজের সবকিছুকে দুহাতে উজাড় করে দিয়ে সাহিত্যের সূর্য ডুবতে চলল। শেষ বেলায় রাঙিয়ে যাবার মত তুলির আঁচড়ে সমস্ত পৃথিবীকে তোলপাড় করে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। তারপর একসময়—

"জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
নিশীথের পানে গহনে হয়েছে হারা।
অঙ্গুলি তুলি তারাগুলি অনিমেষে
মাভৈঃ বলিয়া নীরবে দিতেছে সাড়া।
ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ কূল হইতে নব জীবনের কূলে
চলেছি আমরা যাত্রা করিতে সারা॥
হে মোর সন্ধ্যা, যাহা কিছু ছিল সাথে
রাখিনু তোমার অঞ্চলতলে ঢাকি।
আঁধারের সাথী, তোমার করুণ হাতে
বাঁধিয়া দিলাম আমার হাতের রাখী।
কত যে প্রাতের আশা ও রাতের গীতি,
কত যে সুখের স্মৃতি ও দুখের প্রীতি,
বিদায় বেলায় আজিও রহিল বাকী॥

যা কিছু পেয়েছি যাহা কিছু গেল চুকে,
চলিতে চলিতে পিছিয়া রহিল পড়ে,
যে মণি দুলিল যে ব্যথা বিঁধিল বুকে,
ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে,
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের 'পরে ॥"

পরিশিষ্ট ঃ

'ললিত সাহিত্য' প্রকাশভবন থেকে ২০০ খণ্ডে 'বিশ্বসাহিত্যের গ্রন্থাবলী' নামে যে রচনা প্রকাশিত হচ্ছে তাব 'বিশ শতকের সাহিত্য' সিরিজে ৩ লক্ষাধিক কপিতে বেরিয়েছে রবীন্দ্রনাথের রচনা সংকলন। তাতে আছে তাঁর কবিতা, গল্প এবং গোরা উপন্যাস।

এখানে উল্লেখযোগ্য, অন্যান্য রচনাব সঙ্গে সেখানে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির জনপ্রিয়তা। তাঁব আঁকা বহু ছবির প্রতিলিপিও বইটিতে স্থান পেয়েছে। (সোভিয়েট দেশ, ১৯৭৩)

বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথের আঁকা যে সমস্ত ছবি এদেশের যেসব স্থানে ছড়িয়ে আছে তাদের মধ্যে শান্তিনিকেতন ববীন্দ্রভবনে রাখা মোট ছবির সংখ্যা ১৫৬৪।

কলকাতায় অ্যাকাডেমি অফ্ ফাইন আর্টসে আছে ৩৫ খানা ছবি। এছাড়া ববীন্দ্রভাবতীতে অ্যাকাডেমির মত সাজিয়ে রাখা আছে ৪৬ খানা ছবি। আব 'নন্দন' শান্তিনিকেতনে বয়েছে ১৫-২০ খানা।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ সবসমেত কত ছবি এঁকেছিলেন তার কোনো সঠিক হিসেব আজও জানা যায় না। জানা সম্ভবও নয়। এ সম্বন্ধে কেউ কেউ বলেন ২,৫০০, কেউ বলেন ৩,০০০ কিন্তু এ সংখ্যা শুধু আনুমানিক হিসেব মাত্র।

কেননা ছবি আঁকার বছরগুলিতে তিনি বিভিন্ন দেশে ঘুরেছেন। এ সময় তিনি এঁকেছেন, ঘনিষ্ঠদের বিলিয়েছেন, নয়তো বিশ্বভারতীর আর্থিক প্রয়োজনে বিক্রয় করেছেন। এমনিভাবে দেশে বিদেশে তাঁর যেসব ছবি ছড়ানো আছে তার প্রকৃত সংখ্যা পাওয়া সহজসাধ্য নয়।

যে সব বই আমাকে আলোর পথ দেখিয়েছে

১। আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ ... রাণী চন্দ

২। মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ... মৈত্রেয়ী দেবী

৩। চিত্রদর্শন ... কানাই সামন্ত

৪। বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ ... মৈত্রেয়ী দেবী

৫। গগনেন্দ্রনাথ ... মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

৬। রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা ... অমিতাভ চৌধুরী

৭। রবীন্দ্রনাথের পকেট বুক . অমিতাভ চৌধুরী

৮। ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ ... শঙ্খ ঘোষ

৯। রবীন্দ্র চিত্রকলা মনোরঞ্জন গুপ্ত

১০। জোড়াসাঁকোর ধারে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১। চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ . রাণী মুখোপাধ্যায়

ও অন্যান্য।

1. Centenary Book of Tagore ... Anand Muluk Raj
2. India and Modern Art ... W. G Archer
3. Rabindranath Tagore ... Hiranmoy Banerjee
4. Homage to Tagore ... B. M. Choudhuri
5. Paintings of Radindranath ... Bishnu Dey
6. Calcutta Municipal Gazette.
7. Tagore Centenary Publication.
8. Press Cuttings (Different Papers).